প্রথম বর্ষ
শারদ সংখ্যা
কবিতা
গল্প
প্রবন্ধ
চিত্রকলা
অনুগল্প
রম্যরচনা
বাংলা কাহিনী
সাহিত্য পত্রিকা
BANGLA KAHINI PUBLISHER

প্রথম বর্ষ

শারদ সংখ্যা

বাংলা কাহিনী

সাহিত্য পত্রিকা

১৪২৮

Bangla Kahini Publisher

West Bengal, INDIA

বাংলা মায়ের সন্তান আমরা
বাংলা আমাদের গর্ব
বাংলা শুধু একটি ভাষা নয়
বাংলা আমাদের পরিচয় ।

- রঞ্জন সাউ

সূচিপত্র

অমৃতপা শীল

শারদ সংখ্যা

১৪২৮

সোসোহিনী শবনম

(হুগলি, পশ্চিম বঙ্গ)

" শ্রেয়সী শরৎ "

অরবিন্দ সরকার

(বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ)

শিউলি ফুল উঠোনে বনে কাশফুল,
ভাসমান মেঘ ঊর্ধ্বে বাহারী বাতাস,
শিশির ঘাসের মাথে শ্বেত বিলকুল,
পদ্মপুকুরে নলিনী চড়ে রাজহাঁস।

ধানশীষে দোলাজাগে, এলোকেশী চুল,
বাড়ীঘর ঝলমলে পূজার আশ্বাস,
ঢাকী তার বোল তুলে,ঝেড়ে কালিঝুল,
দেবী আগমন বার্তা অসুর বিনাশ।

ময়ূরী পেখম তুলে নৃত্য পদ স্থূল,
বাঁধন ছাড়া আনন্দে মেটে শিশু আশ,
দীনের পূজা পার্বণ অর্থ তার মূল,
প্রকৃতির সাজসজ্জা নাকেতে সুবাস।

গরীবের গড়াগড়ি দেবীর গমনে,
পদধূলি নিয়ে মুখে প্রণাম চরণে।।

" জীবনের উপলব্ধি.... "

কৌশিক আচার্য

(বাঁকুড়া, পশ্চিম বঙ্গ)

মেনে নিতে মানিয়ে নিতে কখন
যে জীবন শেষ হয়ে যায়,
তা অনেকেই পারেনা বুঝতে...
চলমান জীবনে থেকে যায় কত অপ্রাপ্তি।

জীবনে কেউ কিছু না চাইতে
পেয়ে যায় অনেক অমূল্য রতন,
আবার প্রাপ্য ব্যক্তিদের প্রাপ্তি
চিরজীবন শূন্য রয়ে যায়।

জীবন থেকে আজ গভীর উপলব্ধি
অর্থ ও ক্ষমতা আছে যার সেই ব্যক্তিরা
অর্থ ওক্ষমতাহীন ব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত
ভুলুন্ঠিত করে নিজ ক্ষমতা,সন্মান বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।
এটাই মোর জীবনের বড় উপলব্ধি।।

" উমা এলো "

আলাপন সামন্ত

(পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বঙ্গ)

বছর পরে আসছো উমা,
উমা,তুমি দুর্গা তুমিই কালী,তুমি জগৎ দুঃখহরা
আসছো তুমি আনন্দেরই কলস হাতে,
আনন্দ, সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে ।

কার্তিক, গণেশকে সঙ্গে করে,
আসছো উমা শিবের হাতটি ধরে,
লক্ষ্মী আসছে সরস্বতীর হাতটি ধরে,
কাশের ফুল হাতে করে ।

বাহন গুলোও সঙ্গে আছে,
অসুরও বায়না করে সঙ্গে তোমার যাবে বলে,
পরিবার নিয়ে উমা এলো সন্ধ্যা কালে,
চারটে দিন থেকে উমা শিবের সঙ্গে যাবে চলে ।

" আমার গ্রাম "

অশেষ গাঙ্গুলী

(বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ)

বাম্ভণী নদী তীরে আমার গ্রাম টি গো
সে গ্রামের ভোর দেখিতে
লাগে বড়ো ই সুন্দর
মনে হয় ফুলের পাপড়ি
মেলে ছেড়ে তার ডানা
পাখির কুঞ্জনে জেগে উঠে গ্রাম
গ্রামের চাষিরা সব গুরু নিয়ে মাঠে যায়
আনন্দেতে সারাদিন চাষ করে
ফিরে তারা বিকেলেতে
গ্রামে র   ছেলে - পুলে
সারাদিন   খেলা করে
গ্রামের মেয়ে - বউ রা পুকুরে

যাই তারা স্নান করিতে
ফেরে তারা জল ভরে কলসেতে
এই ভাবে সূর্য যখন আসে মাঝ গগনেতে
গায়ের ছেলে রা সব খেলা সেরে বাড়ি ফেরে
যাই তারা পুকুরে তে স্নান করিতে
পুকুরেতে করে ওরা ঝাপাঝাপি।

সারাদিন এই ভাবে
কেটে যায় গায়ের মোর গায়ের মানুষের

বিকেলেতে কাজ সেরে ফেরে
মোর গায়ের চাষি
এই ভাবে সন্ধে নামার আগে
পাখিরা ফিরে যাই নিজ বাসায়
গ্রামে র ওই অন্ধকার
আকাশে নেমে আশে তারা
চাঁদের আলোয় তারা আর জোৎস্নার
আলোয় ঝিলিক লাগে আমার গ্রামে ।।

" বাসস্টপের সেই প্রেম "

প্রদীপ কুমার দে

(পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ)

ফেলে আসা সেই সব দিনে
বাসস্টপের সাদা-কালো মুহূর্তগুলো
আজও রঙিন,
আজও প্রাণবন্ত।
শহর যখন আলসে দুপুরে ভাতঘুমে আচ্ছন্ন,
তুমি আমি তখন প্রজাপতি পাখার রঙ মেখে
অচেনা মেঠোপথ চিনে নিচ্ছি।
স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দুপুরের বয়স ক্রমশ বাড়ছে।
ভ্রুক্ষেপ নেই -
পায়ের তলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
সময়ের শিষধ্বনি।
জোনাকির আলো বন্দক রেখে
তোমার নরম হাতে সবটুকু আদর মেখে,
ফিরে আসি বাসস্টপে;
আদিম শুন্যতা রেখে শেষ বাস চলে গেছে।

" তোমার ভালোবাসায় "

শুভজিৎ বিশ্বাস

(উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)

শব্দগুলো আজ অর্থহীন, মুখগুলো নির্বাক
ভালোবাসা লুকিয়েছে দেখ চোরাবালিতে,
প্রেমের যুগলবন্দী ফটোগুলো ভস্ম হতে চায়
পুড়িয়েছি নিজেকে তার অল্প তাপের ছোঁয়াতে।

অন্ধকার তবুও ঘোরাঘুরি করছে আমার চারপাশে,
শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের কাঁটা এখন মৃতপ্রায়
পাপড়ির রঙে কেউ টেনেছে হয়ত কালো রংতুলি।
কোকিলটা আজকাল কেমন বিশ্রী সুরে গান গায়।

স্পর্শগুলো মাঝে মাঝেই স্বপ্ন ফেরির মতো খোঁজে
রাত জেগে পুরানো বইয়ের ভাঁজের চিঠির মানে,
মনে হয় এক অশরীরী আত্মা আমার পাশে বসে
হাত বোলায় হাতে আর কি যেন বলে কানে কানে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা সেই অপেক্ষারা
আজ অহেতুক হয়ে পড়েছে অবশ,হতাশ ও ক্লান্ত
ঘন্টার কাঁটা যেন এখন নিয়েছে মিনিটের স্থান
মধ্যরাতের নীরাবতা ক'দিন হয়েছে দেখি খুব শান্ত।

সময়ের পরোয়া করিনা আর,অজুহাতও মুক্তি চায়
বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি দু'জনে মুখোমুখি
স্বল্প আনন্দের বিনিময়ে অলসতা তো নিয়েছে ছুটি

প্রয়োজন হয় না তার আর,সেই পরশ্রীকাতর সখী।

তবুও চাতকের মতো চেয়ে থাকি আকাশের পানে
অল্প একটু ভালোবাসার পুষ্প বৃষ্টির কামনায়,
ঘাড়ের কাছে চেনা নিশ্বাস,ফিরুক সেই চেনা স্পর্শ
মুহূর্তগুলো অবিকল হোক, তোমার ভালোবাসায়।

" হঠাৎ দেখা "

সৌমি নন্দী

(আসানসোল, পশ্চিম বঙ্গ)

সেইযে...সেই দিনটা থেকে অপেক্ষায়,
হয়তো আসবি না জেনেই প্রহর গুনছি।
হাজারো মেঘমালা স্পর্শ দিচ্ছে সেই ছোট্ট ভালোবাসার
তরীতে।
সেই ভালোবাসার তারকাটাই...
যেন বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে তোর কথা।
তোর জন্য স্বার্থপর এই মনটা,
পাগল হয়েছে তোকে দেখার ঐ ভাবনায়।
তারপর হয়তো আসবে সেই দিনটা...
দেখাটা হবে হঠাৎই কিছু না ভেবেই না বুঝেই।
পুনরায় আবারো হবো বৃথা এ ভালোবাসায়,
মনের মধ্যে বাসা বাঁধা হাজারো আশা ধ্বংস হবে।
সুন্দর সন্ধ্যাটা আবারো হয়ে পড়বে
কালো, ঘন রাত্রির মতো নিঝুম, নিঃসঙ্গ, নিবিড়।
সবই আবারো হেরে যাবে
আমার ভালোবাসার সামনে।
ভালোবাসার সেই যন্ত্রনা আবারো
শেখাবে তোকে নতুন করে খোঁজার ভাবনা।
সেই হঠাৎ দেখা আশা দেখাবে আবারো,
আবারো করে দেবে চৌচিড় ভালোবাসার
সেই মূর্ত প্রতীককে।।

" জীবন-তরী "

তন্দ্রা ঘোষ

(নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ)

জীবন তরীখানি বাইতে গিয়ে দেখি,
খুব সহজ ছিল না মোটে।
জোয়ার ভাঁটার টানে খেই হারিয়ে,
দোদুল্যমান তরী বাঁধি ঘাটে।
পাখপাখালির ঘরে ফেরার তাড়া,
সূয্যিমামা যখন বসে পাটে।
নতুন সকাল হলে,বাইতে থাকি তরী,
যখন ঊষার আলো ফোটে।
পথ আটকে ধরে,যেথায় মজা নদী,
হোঁচট খেয়ে পড়ি।
সামলে নিয়ে আবার,চলার নেশায় উঠে,
বৈঠাখানি আগলে ধরি।
ঝড়-বাদলার দিনে,প্রায় হাবুডুবু তরী,
লড়াই করে বাঁচে।
প্রখর রোদের তাপে,হাঁসফাঁসিয়ে ওঠে,
গনগনে সেই আঁচে।
সারাদিনের শেষে,শ্রান্ত হয়ে মাঝি,
একটু বিরাম খোঁজে।
জীবন তরী বাওয়া,মোটেই সহজ নয়,
মাঝি সেটা বোঝে ।

" তোমাদের দর্প... "

রিকি ঘোষ

(জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ)

‘সম্রাজ্য’ উদ্ধারের পশ্চাৎ ‘
মুহূর্ত’ মেতেছে উল্লাসে বিষাদের সুরে...
আতঙ্কের ছোঁয়া শরীরের
মধ্যখানে ভীত গড়েছে, অজানা দর্পে।
মানবের মানবিকতা
নিংড়ে রয়েছে হাহাকার জুড়ে—
জোর জুলুমের রাজত্ব মত্ত—
মানুষ মারার খেলায়, গর্বে।

শিউরে ওঠে ‘দখলদারির’
দখল করা দাঁড়ের শির—
তলোয়ারের সেই ধারের স্পর্শে;
মৃত্যু ভয় বড্ড জালায়।
এদিক ওদিক ছোটাছুটি
পিঁপড়ের মতন হাজারে হাজারে;
কল্পনা যদি মিথ্যে হতো—
সত্যিই তবে ছুটতো
‘বিত্ত’ সহজতর যাত্রাপালায়...!!

বন্দুক, বোমা, তলোয়ারের সামনে
জমেছে লাইন দিয়ে মানুষের হাহাকার।
ভীত–সন্ত্রস্ত রোগে আক্রান্ত
পালাবার নেই পথ যাদের;
যাবেও বা কোথায় ছেরে ভিটে মাটি

ঘটি বাটি আর হাতের লাঠি...
উপায় লুকিয়ে বদ্ধ বাড়িতে উক্তি ছেড়েছে—
"আপনে বাঁচলে বাপের নাম।
নইলে আমি কাদের?"
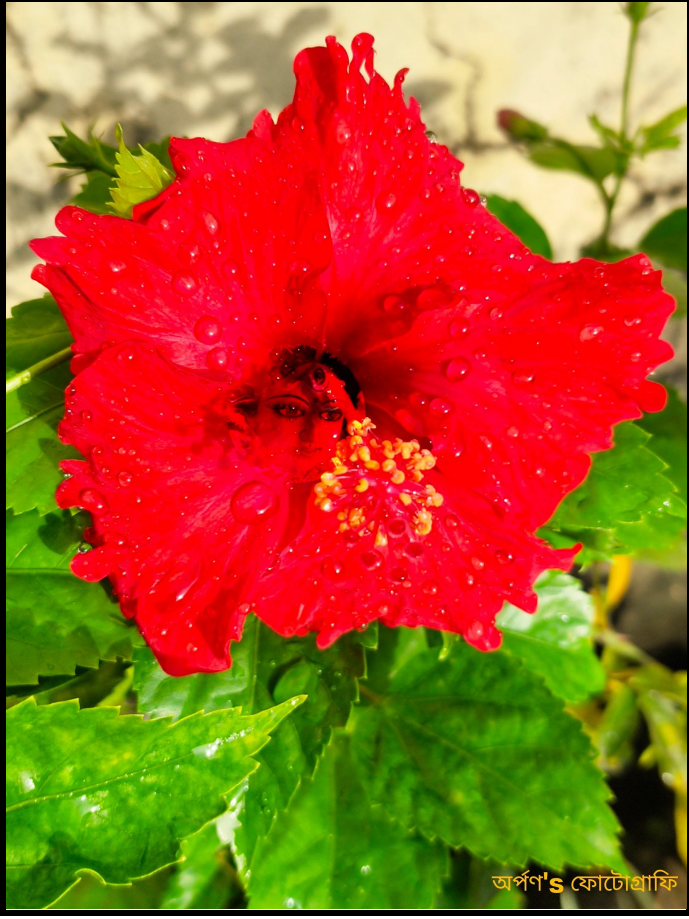
অর্পণ চৌধুরী

(কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ)

DEBOPRIYA KUNDU

(হুগলি, পশ্চিম বঙ্গ)

|| অনুগল্প ||

" মা --এসেছো "

আশীষ কুন্ডু

(বালেশ্বর, ওড়িশা)

বৃষ্টিটা এসে গেলো হঠাৎ। শরতের উড়োমেঘে
এমনটা হয়, এই সব ভাবতে ভাবতে শৌনক
একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়ালো বারান্দায়। অধিকাংশ দোকান আজকাল বন্ধ
থাকে সন্ধেবেলা। এখন সব অনলাইন সার্ভিস।
খুব প্রয়োজন না হলে দোকানে কেউ আসে না। লোকজন এই পূজোর সময়ে, একটু বেরোয়। ২০৫০ সালে দাঁড়িয়েও বাঙালী দুর্গাপূজোর সময় সেই সাবেকী বাঙালি। এখন
ব্যক্তিগত গাড়ি কারো নেই। প্রদূষণের কারণে
সরকার দশ বছর আগেই মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট পাল্টে ব্যক্তিগত চারচাকা বাতিল করে
পুরোটাই কর্পোরেট ব্যবস্থার হাতে দিয়েছে। দরকার হলেই অনলাইনে অর্ডার দিলে অটোড্রিভন কার হাজির দোরগোড়ায়। নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে ভেহিকল।
তাই ঠাকুর দেখা পদব্রজে,অথবা- মেট্রো সার্ভিসের সাহায্যে। পাতালরেল এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে।
হঠাৎ করে একটা মেয়ে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো
শৌনকের পাশটায়। মাস্ক পড়া মুখটা দেখার
ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব নয়। দূরে ঢাক বাজছে।
পাঁচদিন ঢাক বাজে পাড়ার মোড়ে মোড়ে। ভিডিও স্ক্রিনে রেকর্ড করা ঢাকের আওয়াজ সাথে অ্যানিমেটেড নৃত্য। ঢাকিরা আজকাল

উধাও হয়ে গেছে। ছোটবেলায় পূজোর প্যান্ডেলে ঢাকির ঢাক বাজানোর স্মৃতি এখনো প্রবলমাত্রায় উজ্জ্বল।
মেয়েটা হঠাৎ হাত বাড়ানো, বললো, "চলো তোমায় পুরোনো কলকাতার পূজো দেখিয়ে আনি। আমার নাম পার্বতী। "শৌনক অবাক হলেও রাজি হয়ে গেলো মেয়েটার কথায়। অমোঘ আকর্ষণ মেয়েটার চোখে। ছোটবেলায় পড়া পথের পাঁচালীর গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন আর ছাপা বই পড়া হয় না।ই-বুক পড়ার
উৎসাহ পায় না। তারপর কাজের চাপ। যদিও
অন্য অধিকাংশেরই মতো ওয়ার্ক ফ্রম হোম।
অফিসগুলো ছোট হয়ে গেছে। সীমিত লোক সীমিত সময়ের জন্য অফিসে যায়, কিছু বিশেষ কাজের জন্যে। তাই বাড়ী বসেই কাজ
ল্যাপটপ নিয়ে, প্রায় সারাদিন ও সন্ধেটা কাজে
কেটে যায়। বাজার যেতে হয় না ,-ই-মার্কেটিং এর সৌজন্যে। বাড়ীতে সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অনলাইনে কথা বেশি, অফলাইনে কম।
শৌনক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চলেছে। বৃষ্টি ওদের ছুঁতে
পারছে না। একডালিয়া প্যানডেলে ধুনুচি নাচ দেখতে দেখতেই শৌনক মায়ের মুখটা খেয়াল করে দেখতে গিয়ে, দেখলো মায়ের মুখের আদল এই মেয়েটার মতো। পার্বতী হাত তুলে
নাচছে। মুখের মাস্ক সরে গেছে। অবিকল প্রতিমার ঘামমুখ। কপালে কি ত্রিনয়ন আছে, দেখতে গিয়ে চোখটা ঝাপসা হয়ে গেলো। চোখ খুলতেই শৌনক দেখলো, নিজের বাড়ীর
একান্ত কামরায়। সামনে কম্পিউটার স্ক্রিন। তাতে ফুটে উঠেছে সেই প্রতিমার মুখ। অস্ফুট
স্বরে শৌনক বলে, "মা --তুমি এসেছো----! "

|| গল্প ||

" দাম্পত্যের দিনলিপিতে অন্যপুজো "

মণিদীপা দত্ত

(হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)

বিপিনবাবু সকালবেলায় বাজার থেকে হাতমুখ ধুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেই স্বর্ণময়ী বলতে শুরু করলো,
"এখন এতো মাছ বেছে রান্না করবে কে?আমার গতর সস্তা!
সকালে স্বর্ণময়ীর কাজ আর মুখ একসাথে চলে সমানভাবে। বিপিনবাবুও চুপ থাকার মানুষ নন, তিনিও রসিয়ে রসিয়ে এমন জবাব দেন স্বর্ণময়ী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।
"বিবাহবিভ্রাট যখন হলোই ভুলটা না ভাঙলে এমন দজ্জাল বৌ তো আমার কপালে জুটতো না!"
বিপিন বাবুর কথাশেষে স্বর্ণময়ী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে,
"অ্যাঁ এতো বড়ো কথা! আমি দজ্জাল!আমি বলেই তোমায় বিয়ে করেছি,তোমার মতো কুচ্ছিত লোকের সাথে থাকতে থাকতে আমার জীবনটাই নরক হয়ে গেছে।"

পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে বিপিনবাবুর,স্ত্রীর বাক্যবাণ সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে। বিয়ের দিনের সেই বিভ্রাট মানসপটে ভেসে ওঠে বিপিনবাবুর। তিনি

ভুলবশত পাশের এক বিয়েবাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন।ভীড়ে গুঁতোগুঁতিতে গলদঘর্ম হয়ে ভির্মি খাওয়ার জোগাড় হয়েছিল।শেষ পর্যন্ত কনে অর্থাৎ স্বর্ণময়ীর বাবা এসে সাদরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলে তিনি নিস্তার পেয়েছিলেন।
গিন্নির গজগজানিতে বিপিনবাবু বাস্তবের মাটিতে ফিরলেন-
"কেমন গুছিয়ে সংসার করতে হয় সবিনয়বাবুকে দেখে শেখো।"
"বিবাহিতদের সবসময় পাশের বাড়ীকে বেশী মিষ্টি লাগে।আমারও মনে হয় ও বাড়ীর মন্দিরাবৌদি তোমার চেয়ে বেশী কর্মপটু"।কথা শেষে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের অপেক্ষা না করেই বিপিনবাবু স্নানে গেলেন।স্বর্ণময়ী তাঁর কথাগুলো শুনতে না পাওয়ায় ঝগড়া থেমে গেলো।তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে রান্নার তোড়জোড় শুরু করলো।বিপিনবাবু সকালে খেয়ে বেরোবেন।বিপিনবাবু চিরকালই আত্মভোলা, সংসার সম্পর্কে উদাসীন মানুষ।স্বর্ণময়ী সংসারটা ধরে রেখেছে শক্ত হাতে।স্বামীর জন্য স্বর্ণময়ী রান্না করেছে বিপিন বাবুর পছন্দের সজনে ফুলের বড়া, শুক্তো,মাছের মাথা দিয়ে ডাল,মাছ।হাত চাটতে চাটতে খুশী বিপিনবাবু বলেন,"তোমার হাতের রান্না খেয়ে দিনদিন বহরে বেড়েই চলেছি গিন্নী।"বেরোবার সময়ে স্বর্ণময়ীও গদগদ হয়ে স্বামীকে বলে,"তোমার ভাঙা স্কুটারটা বাতিল করে নতুন একটা কেনো না বাপু!পুরনোতে বিপদ হতে কতক্ষণ।"কথপোকথন শেষে বিপিনবাবু স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দেয়।

বিপিনবাবু একটা শাড়ীর দোকানের হিসাবরক্ষক তার সঙ্গে খদ্দেরদের শাড়ীও বিক্রি করেন।রোজগারপাতি যা হয় দুমানুষের চলে যায়।সন্ধ্যেবেলায় চা, জলখাবার খেতে খেতে বিপিনবাবু স্ত্রীর সাথে সন্ধ্যেটা কাটান।আজ

বিপিনবাবু ফেরার সময় হঠাৎই মনে পড়লো দোকানের খাতায় একটা হিসেব তুলতে ভুলে গেছেন।অন্যসময়ে হলে চাবী তার কাছে থাকায় একবার গিয়ে হিসেবেটা লিখে আসতেন।বর্তমানে মালিক পরিবর্তনে অবস্থা বদলেছে।মালিক খুব কড়া,চাবী নিজের কাছে রাখে।বিপিনবাবু সকালে দোকান খোলামাত্রই পরেরদিন হিসাবটা লিখে আসবেন।এমনই ভেবে রেখেছেন।এই খাতা লেখার চাকরীটাই বিপিনবাবুর অন্নসংস্থান করে।পরেরদিন সকালে লকডাউন।দোকানপাট বন্ধ।ব্যস বিপিনবাবুর মাথায় হাত। অর্ধাঙ্গিনী এই দুঃসময়ে তার মনজোর জোগানোর সবচেয়ে বড় বন্ধু।স্বর্ণময়ীও বিপিনবাবু ছাড়া নিঃসঙ্গ।এমতাবস্থায় তাদের গ্রাসাচ্ছনের ব্যবস্থা হবে কিভাবে! স্বর্ণময়ী ব্লাউজ, চুড়িদার তৈরী সহ জামাকাপড় সেলাই করতে শুরু করে দেয়। সামান্য কিছু যা আয় হয় স্বামী-স্ত্রীর কোনরকমে চলে যায়।কিছুদিন পর অল্প পুঁজি নিয়ে জামাকাপড়ের ব্যবসা শুরু করে।এই দম্পতি আজীবন নিকট আত্মীয় পরিজনের সুখে সুখী হয়েছে। বিপিনবাবুর অবিবাহিত বোনের বিয়েও শ্বশুড় শাশুড়ীর অবর্তমানে স্বর্ণময়ী ধুমধাম করে দেয়।

আশ্বিন মাসের শুরুতে ওরা আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে পুজোর তত্ত্ব পাঠায়।ভাইপো,বোনপো,বোনঝি,ভাগ্না-ভাগ্নীদের মুখের আনন্দটুকুই সব। একবার পুজোয় ওরা ওদের ছেলেকে অ্যাক্সিডেন্টে হারায়।দুর্গাপুজো এলেই সন্তানশোকের কষ্টটা শরতের টুকরো মেঘের মতো ঐ দম্পতির মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায়।পুত্রশোক ভুলতে নিঃসঙ্গ ওরা পুজোর সময় পরিজনদের নিয়ে মেতে থাকে।তাদেরকে বাড়ীতে ডেকে গল্পগুজব করে, খাওয়ায়,নতুন জামাকাপড় দেয়। কিন্তু এবার পুজোয় ওরা কি করে আনন্দ করবে!

বিপিনবাবুর কাজ নেই। সংসারে আয় সামান্য!তাই পুজোটা শুধুমাত্র দুজনে কাটাবে বলে ঠিক করেছে।

এবারের দুর্গাপুজোর ঐ চারদিনে স্বামী স্ত্রী সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে বড়ো রাস্তার ব্রিজের ধারে। মাঠে সারি সারি কাশফুল,আকাশে নীল সাদা মেঘ চারপাশের ঢাকের আওয়াজ জানান দেয় মা দুর্গা মর্ত্যে এসে গেছে। বিপিনবাবু,স্বর্ণময়ী ব্রিজের ধারে দাঁড়িয়ে দেখে সুবেশে নারীপুরুষ ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে। তাদের কলরবে মনে কেমন যেন নিমেষে সব কষ্ট মিলিয়ে গিয়ে পুজোর আনন্দ আসে। চারটে দিন ব্রিজের ধারে প্রাকৃতিক শোভার সাথে মানুষের ভীড় দেখতে দেখতে কেটে যায়। স্বামী-স্ত্রী মশগুল হয় নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্পে। দশমীর দিনে নদীতে মায়ের বিসর্জন। মানুষের ভীড়। বিপিনবাবু বলেন,
"কাঠামোকে মাটি লেপে মূর্তি গড়ে মানুষ কেমন পুজো করে !জলে পড়লেই সব শেষ। অথচ মর্ত্যবাসীর বিশ্বাস দেবী দুর্গা ঐ মাটির মূর্তিতে আছে। এই ভেবেই এত আয়োজন..."
কথা শেষে স্বর্ণময়ী বলে "মানুষের বিশ্বাসটাই সব। বিশ্বাস না থাকলে কিছুই সম্ভব না। "হয়তো এই বিশ্বাসের জোরেই তাদের সংসারে একদিন সুদিন আসবে।

প্রতিমা নিরঞ্জন শেষে বিপিনবাবু ও স্বর্ণময়ী আবার চেনা জীবনের ছন্দে ফেরে। তবে পুজো অবসরে দাম্পত্যের দিনযাপনে ওদের মধ্যে নতুনভাবে বোঝাপড়ায় একঘেয়েমিতা দূর হয়। সম্পর্কের ভিত আরো পাকাপোক্ত হয়।

|| ভৌতিক গল্প ||

" কাকের পালক "

অনাদি মুখার্জি

বেশ অনেক দিন আগের কথা, তখন আমি থাকতাম গ্রামের বাড়িতে ! গ্রামের মধ্যেই অনেক গাছ ছিল আর রাতের বেলায় নানা রকম আওয়াজ শুনতে পেতাম ! তবে সেই শীতের রাতে সেই আওয়াজ টা আমি এখনো ভুলতে পারেনি ! আমাদের বাড়ির সামনে একটা খুব পুরাতন নারকেল গাছ ছিল আর তার পাশে একটা তেঁতুল গাছ ছিল ,যখন ঝড় উঠে তখন খুব ভয় হয় পাচ্ছে আমাদের বাড়ি টা পড়ে যায় !

আমাদের বাড়ির অপর দিকে একটা দোতালা বাড়ি ছিল ,সেই বাড়িতে একজন বয়স্ক মহিলা থাকতো !তার কোনো ছেলে মেয়ে ছিল না ,সেই একাই থাকতো ! বাড়ি থেকে মহিলা টি খুব বেশি বের হতো না ,মাঝে মধ্যেই বারান্দায় বসে বই পড়তো আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতো !

যাই হোক আমি আসল কথা তে আসি !

তখন শীতকাল ছিল শীতের রাতে ঘুম হয় খুব আরামে,এই সময়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ! সেই রাতে ও আমরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ,হঠাৎ একটা বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো ! দেখি তখন প্রচন্ড হাওয়া বইছে ,এখন শীতের সময় আকাশ জুড়ে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে ,আমি কিছু বুঝতে না পেরে জানালার বাইরে তাকালাম ,দেখলাম

আমাদের বাড়ির সামনের নারকেল গাছ টা প্রচন্ড হাওয়ায় নড়ছে কিন্তু বাকি গাছ গুলো খুব শান্ত হয়ে আছে !তার পর হঠাৎ নজরে আসে সামনের তেঁতুল গাছ টা খুব জোরে হাওয়া দিয়ে নড়ছে আর সেই থান থেকে একটা ডাল লম্বা হয়ে নারকেল গাছ টা কে কি যেন বলছে ! দেখে আমি ভয় পেয়ে আবার দেখি কি ব্যাপার ! সেই সময় তিনটি কাক উড়ে এসে ওই নারকেল গাছটি উপর বসতেই সব শান্ত হয়ে গেল ! এত রাতে আবার কোথা থেকে কাক এল অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম ! একি ভৌতিক ব্যাপার না ভুল দেখছি ভয়ে জানালাটা আমি বন্ধ করে দিলাম !

কি করবো ভেবে পেলাম না ,কাউকে ডাকবো আবার মনে উৎসাহ জাগিয়ে আবার জানালাটা খুললাম ! দেখি কাক গুলো যেন কথা বলছে তেঁতুল গাছ টা সাথে ! তার পর যা দেখলাম তাতে আমার শরীর টা পুরো কাঁটা দিয়ে উঠলো ভয়ে ! দেখি ওই তেঁতুল গাছ টা থেকে একটা কালো ছায়া নেমে ওই বয়স মহিলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো ,কিছু ক্ষণের মধ্যেই বয়স্ক মহিলা টি বের হতে নারকেল গাছ থেকে তিনটি কাক ওই ছায়াটা সামনে এল ,তখনই একটা বিকট শব্দে আওয়াজ শুনতে পেলাম যে কে যেন বলছে তোকে নিয়ে যেতে এসেছি ! ভয়ে আমার শরীর অবস হয়ে গেসলো ! তখন জানালা টা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম !

পরের দিন সকালে উঠে দেখি ওই মহিলার বাড়ির সামনে খুব ভীড় ,আমি সবার সাথে ভীড় ঠেলে ঢুকে দেখি যে মেঝেতে ওই বয়স্ক মহিলাটা মৃতদেহ পড়ে আছে ! আমি খুব ভয় পেয়ে যায় কালকের ঘটনা টা আমার মনে পড়ে কিন্তু কাউকে বলতে পারেনি, কেউ বিশ্বাস করবে না ! হঠাৎ আমার চোখে পড়ে ওই মহিলা পাশে অনেক পালক পড়ে ছিল সেই পালক গুলো কাকের ! আমি ভয়ে বাড়িতে চলে আসি আর ভাবি ওই কাকটি ভুত হয়ে ওই বয়স্ক মহিলা কে কাল মেরেছে ! সেই

রাতের ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারিনি মন থেকে !

|| রম্যরচনা ||

" মার্কেটিং বলে কথা! "

রাজা দেবরায়

(ত্রিপুরা, ভারত)

মার্কেটিং করতে গিয়ে একটিও শাড়ি এবং চুড়িদার পছন্দ না হওয়ায় স্ত্রী রাগে গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরেছেন।

আধঘণ্টা বাদে...

স্বামীঃ সরবত বানিয়ে দাওনা প্লিজ। ভীষণ ইচ্ছে করছে খেতে।

স্ত্রীঃ (রেগে) স্কোয়াশ নেই। আগেই তো জানিয়েছিলাম।

স্বামীঃ লেবুর সরবত করে দাও তাহলে।

স্ত্রীঃ (রেগে) লেবু নেই। আগেই তো জানিয়েছিলাম।

স্বামীঃ চিনির জল দাও তাহলে।

স্ত্রীঃ (আরেকটু বেশি রেগে) চিনি নেই। আগেই তো জানিয়েছিলাম।

স্বামীঃ চিনি ছাড়াই শুধু জল দাও তাহলে।

স্ত্রীঃ (অতিরিক্ত রেগে) জল...

স্বামীঃ আচ্ছা আচ্ছা আমিই নিয়ে নিচ্ছি!!

|| প্রবন্ধ ||

" আগমনী "

সুপ্রমা দাস

(নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ)

আমি রুচিরা সেনগুপ্ত বাঁকুড়া জেলায় আমার জন্ম, সেখানেই আমি বড়ো হয়ে উঠি। তবে কর্মসূত্রে আমি কলকাতার বাসিন্দা।
আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা, আমি বাঁকুড়া ছেড়েছি বেশি দিন হয়নি, বাঁকুড়াতে আমার বাবা আর মা আছে। আমার বাবার একটা ছোটো প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ছোটোবেলাতে সেখানে আমার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। পরবর্তী সময়ে আমার কর্মসূত্রে আমি কলকাতায় চলে আসি, তবে বাবা আর মা আসেনি আমার সাথে। তাই কলকাতার এই ছোট ফ্ল্যাটে আমি একাই থাকি। বাবা মা আসে ছুটির দিনে, আর আমিও সময় সুযোগ বুঝে বাঁকুড়ায় যাই...এটাই আমার গতানুগতিক জীবন। আর পছন্দের জায়গা বা ভালোবাসাও বলতে পারেন, সেটা হলো আমার এনজিও। হ্যাঁ আমি একটি এনজিওর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে আমরা সমাজের কিছু অসহায় মেয়ে বা মহিলাদের কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করি, তাদের কে জীবনের নতুন মানে সেখানো হয়, তাদের নতুন করে বাঁচতে শেখানো হয়।

কলকাতায় আমার সেরকম বন্ধুও নেই, কয়েকজন আমার স্কুলের পরিচিত ছাড়া... কাজের ফাঁকে বা শনিবার রবিবার করে, আমি সারাদিনই প্রায় এনজিওতেই থাকি। বেশ ভালো লাগে জানেন... জীবনটাকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখতে।
আকাশে বাতাসে পূজো পূজো গন্ধ... আশেপাশে মাঠগুলোতে দূর্গা পূজোর জন্য, প্যান্ডেলের বাঁশ পড়েছে ; শহরটা সেজে উঠতে চলেছে নতুন রূপে।

সেদিন শনিবার বিকেলে এই একটু বেরিয়ে ছিলাম আর কি...এনজিওর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম, রাস্তার ধারের বস্তির ঘর গুলো থেকে হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক অসহায় নারীর চিৎকার আর আকুতি ভরা আর্তনাদ। এগিয়ে গেলাম কিছুটা..বুঝতে পারলাম হয়তো তাকে কেউ নির্যাতন করছে,,, দেখলাম একজন নারীর অসহায়তা।
কিছু লোক চেষ্টা করছে পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার, তবে এতো সহজে মনে হয় না সেটা ঠিক হবে, একটু এগিয়ে গেলাম ঝামেলাটা থামানোর চেষ্টা করলাম ; তবে নির্যাতিতা মহিলা নিজেই আমাকে বলে উঠলো, আপনি কে আর আমাদের মধ্যে কেন কথা বলছেন, বুঝলাম এখানে আমার থাকা টা হয়তো ঠিক নয়.. তাই কিছুই করতে পারলাম না..বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম। বস্তিটার থেকে একটু এগিয়ে গেলে সামনে পড়ে একটি মাঠ সেখানে শুরু হয়েছে দূর্গা পূজোর তোড়জোর... চোখের সামনে আজ দেখলাম একদিকে মা-এর আগমনের আনন্দ আর একদিকে একজন নারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার, সেও হয়তো কারোর মা, কারোর মে!..

বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম মা ফোন করছে, ফোনটা ধরতেই মা বললো, কাল আসছিস তো?

আমি বললাম হ্যাঁ মা, আমি কাল আসছি...কাল ভোরেই আমার ট্রেন, মা এর সাথে কথা বলে, ব্যাগ গোছাতে শুরু করলাম।

ঠিক তখনই ডোর বেলটা বেজে উঠলো.... দরজাটা গিয়ে খুললাম.. অদিতি এসেছে (অদিতি আমার বন্ধু, বলতে গেলে কলকাতা শহরে আমার প্রথম বন্ধু, ও আর আমি; এক স্কুলের শিক্ষিকা আর ও আমার এনজিও তে অনেক বার গিয়েছে আমার সাথে)
অদিতি বললো কি হলো কোথায় যাচ্ছিস হঠাৎ করে...?
আমি অদিতিকে বললাম তুই ভুলে গেলি..আজ ৩০শে ভাদ্র, কাল মিনুর তিন বছরের মৃত্যু বার্ষিকী .. অদিতি বললো তাইতো ; এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।
অদিতি বললো রুচি; আমি তোদের বাড়িতে গিয়েছি একবার, মিনুর ছবিও দেখেছি তোদের বাড়িতে ; কিন্তু আমি ওর সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানি না। আমি অদিতি কে বসতে বললাম, আমি চেয়ারটা টেনে বসলাম আর অদিতিকে বললাম তবে আজ তোকে একটা গল্প বলি... অদিতি বলে উঠলো কিসের গল্প?...আচ্ছা বল।
আমি বলতে শুরু করলাম.. মিনু যার ভালো নাম আগমনী রায়.. ও আমার বাবার প্রাইমারি স্কুলে পড়তো, আমার সাথে ওর আলাপ সেখানেই মানে বন্ধুত্ব যাই হোক.. ও পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলো জানিস, আমাদের ক্লাসে ও সেবছর ফাস্ট হয়েছিলো, তারপর আমরা প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে হাইস্কুলে যাই...সেখানেও ওর প্রতিভা কোনো অংশে কমে যায়নি, যদিও মিনু মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেনি, সবাই জানে যে ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না , তাই হয়তো মেয়ে কে ঠিক মতো পড়াশোনা করাতে পারেনি। তবে সেটা নয় জানিস...মিনুর সৎ মা ওকে বিক্রি করে দেয়!!.... এক বিরাট ধনী ব্যক্তির হাতে..সামান্য কিছু

টাকার বিনিময়ে... আর সকলকে বলে যে তারা মিনু কে বিয়ে দিয়েছে শহরে।

তুই তো জানিস অদিতি আমাদের বাড়িতে দূর্গা পূজা হয়, আজও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা...সেদিন ছিলো মহাষষ্ঠী.. মা-এর বোধনের দিন.. বাবা সেদিন সকালে মিনুকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসে..শুনেছিলাম বাবা মিনুকে রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থাতে পায়..আর মিনুর সারা শরীরে ছিলো, অজস্র আঘাতের চিহ্ন...মিনু মানসিক ও শারীরিক দুই ভাবেই বিপর্যস্ত হয়েছিলো গত ছয় মাস।
পরবর্তী সময়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বাবাকে, বলতে গেলে আমাদের পরিবারকে। কারণ একজন অন্য বাড়ির গৃহবধূ কে, একজন অনাত্মীয় হয়ে, আশ্রয় দেওয়া... এটা কিছুতেই আগমনীর বাড়ির লোক বা তার শশুর বাড়ির লোকেরা মেনে নিতে চায়নি.. তবে মিনু ওদেরকে খুব ভয় পেতো..তাই হয়তো ও আর ফিরে যেতে চায়নি ওদের কাছে। আমার আজও মনে আছে জানিস.. বাবা কে অনেক বার সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়..তবুও বাবা লড়াই করেছে গোটা সমাজের সাথে। বাবা বার বার বলেছে, "যে সমাজে মাটির প্রতিমার পূজোতে হাজার হাজার টাকা খরচা করা হয়, আর সেই সমাজেই বাড়ির গৃহবধূ, মেয়ে আর মায়েদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করা হয়" .... "হ্যাঁ আমি বিরুদ্ধে যাচ্ছি এই গোটা সমাজের, এই সমাজ ব্যবস্থার। হয়তো আমি সব আগমনী-দের বিসর্জনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবো না তবে মিনু কে আমি রক্ষা করবোই"!.....।

ঠিক সেই সময় থেকে মিনু আমাদের বাড়িতে আছে, বলতে গেলে আমার বাবা মিনু কে নিজের মেয়ে-এর মতো করেই রেখেছিল। কিন্তু মিনু ওর অতীতকে

কিছুতেই ভুলতে পারেনি, হয়তো মিনু জীবনের খারাপ দিক গুলোকেই দেখেছে বার বার , জীবনের আনন্দটা হয়তো ওর ভাগ্যে ছিলো না, ছিলো শুধু একরাশ অন্ধকার আর রাশি রাশি অপমান।
জানিস অদিতি, মিনু দূর্বল ছিলো না, ও লড়াই করেছে এতোটুকু বয়সে ও অনেক চেষ্টা করছে নিজের জীবনের কঠিন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিন্তু হয়তো ও পারেনি হেরে গেছে, তাই হয়তো ছুটি নিয়েছিলো, জীবনের এই কঠিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

তবে কি জানিস তো, এই যুদ্ধে শুধু মিনু হেরে যায়নি, হেরে গিয়েছিল আমার বাবা। আমার বাবা চেয়েছিলো মিনু কে একটা নতুন জীবন উপহার দিতে, যে জীবনে মিনু ভালো থাকবে, আনন্দে থাকবে। তবে সেসব কিছুই হলো না, মিনু আত্মহত্যা করল!...সেদিন আমি কলকাতায় প্রথম আসি, তাই বাবা আর মা আমার সাথে আসে। আর বাবা মা যতক্ষনে বাড়িতে ফেরে ততক্ষণে মিনু আর নেই, হয়তো সবটাই সমাজের কটুক্তি আর অপমানের জন্য।

সেদিন ছিলো মহালয়া, দেবীপক্ষের শুভ সূচনা, যেদিন মিনু আমাদের ছেড়ে চলে যায়, বাবা সেদিন প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছিল , বাবা ঠিক করেছিলো যে.. সমাজের আর কোনও আগমনী কে অসহায়তার কারণে বিসর্জিত হতে দেবে না। তার জন্য যদি বাবা কে এই সমাজের বিরুদ্ধে যেতে হয়, বাবা তাই যাবে।

আজ তিন বছর হয়ে গেল, মিনু আমাদের মধ্যে নেই, সময় বদলেছে, পরিস্থিতি বদলেছে ; শুধু বদল আসেনি আমার বাবার মধ্যে আর মিনুর হাজারো স্মৃতির মধ্যে। আজও বাড়ি গেলে ওই মিষ্টি হাসিটা খুব মনে পড়ে, ওই আদুরে মখমলে গলার স্বরে রুচি ডাকটাকেও। মনে পড়ে

আজও স্কুলের সেই সব দিন গুলোর কথা। মিনু চলে যাওয়ার পড়ে বাবা অনেক অসহায় মেয়েদের কে তাদের জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছে, তবে মিনু জায়গা কেউ নিতে পারেনি, হয়তো কেউ কখনো পারবেও না।

যাই হোক কফি খাবি তো, দারা করে আনছি। অদিতি বললো, না!.. খাবো না আজ। রুচি কাল মহালয়া দেবীপক্ষের শুভ সূচনা, আগমনীর সুর বেজে উঠেছে চারিদিকে, হ্যাঁ আর ঠিক তিন বছর আগে এই দিনে আমাদের বাড়ির আগমনীর অন্ধকারে বিসর্জন হয়ে ছিলো।

অদিতি বললো রুচি তুই কি এই জন্যই এনজিওতে কাজ করিস?... আমি বললাম হ্যাঁ, আমি চাই সমাজের সব নারীর স্বাধীনতা, সন্মান আর কিছু অধিকার থাকুক, যার ফলে তারা নিজের জন্য কিছু করতে পারে, নিজের মতো করে জীবনে বাঁচতে পারে। হয়তো মিনু আমাকে শিখিয়ে দিলো, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকা এতোটা সহজ নয়। তাই আমি এই এনজিও তে কাজ করি, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাটাকে হয়তো আমি পরিবর্তন করতে পারবো না, তবে চেষ্টাতো করতেই পারি বল, প্রয়োজন শুধু এক টুকরো সন্মান, যে দেশে মাটির প্রতিমাকে মায়ের সন্মানে সন্মান দেওয়া হয়, সেই দেশে প্রতিটি বাড়ির গৃহবধূ, মেয়ে ও মাও যেন, তার প্রাপ্য সন্মান টুকু পায়। তাদের যেন অসহায়তায় দিন কাটাতে না হয়, সমাজে নারীরাও যেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে..!।

জীবনের হাজারো ভালো দিক গুলোকেই আমার ভালোবাসি, কারণ আমাদের জীবনটা হয়তো আনন্দ উল্লাসে মোড়া। কিন্তু মিনু আমাকে শিখিয়েছে জানিস, কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই কারার ইচ্ছেশক্তি থাকাটাও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রত্যেক নারীর জীবন

হয়তো, আনন্দে মোড়া থাকে না...! এই জন্যই আমি এনজিওর সাথে যুক্ত হয়েছি।

অদিতি বললো রুচি একদম ঠিক বললি, এবার থেকে আমিও তোর সাথে এনজিওর জন্য কাজ করবো...আমি হেসে বললাম তোর ইচ্ছে... কিন্তু আমি চেষ্টা করবো, যেন আর কোনো আগমনী কে বোধনের আগেই বিসর্জিত না হতে হয়....।
মা আসছেন, শহর জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে ভক্ত দের ভীড় দেখা যাবে। মা অলংকৃত হবেন ব্যয়বহুল আড়ম্বরে। তবে মায়ের পূজো সার্থক সেদিন হবে, যেদিন সমাজের আর কোনো আগমনীর অকাল বিসর্জন হবে না।

|| গল্প ||

" অনুপ্রেরণা "

স্বাগত খাঁড়া

(হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ)

আমার অনুপ্রেরণা ভারতের বীর মাটির আপন সন্তান স্বামীজি তথা স্বামী বিবেকানন্দ। তাকে হয়তো অনেকেই চেনেন না। আর হ্যা, ঠিক কথা যে তিনি সশরীরে আমার চারপাশে নেই কিন্তু আজ আমি যা লিখতে চলেছিল তাতে আশা রাখি আপনারা বুঝতে পারবেন কেনো তিনি আমার অনুপ্রেরণা ও না থেকেও তিনি আছেন। আসলে শরীর যায় তার সত্তার শক্তি থেকে যায় ।সেই জন্য তিনি সারা বিশ্বব্যাপী খ্যাত । শিকাগোর কানায় কানায় এখনো তার সেই ধ্বনি স্পন্দিত হয়- "sisters & brothers of America," যা বলেছিলেন তিনি । এটি সেই বাক্য যা শিকাগোয় স্বামীজির স্বর্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার নিচে খোদাই করা আছে ,এই ৫ শব্দ।

"মন চলো নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে , বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেনো অকারণে?
",মন চললো নিজ নিকেতনে।

তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন। তার গুরুভাই তুরিয়ানন্দকে বলেছিলেন ৪০ বছর পেরবেন না।সেইমত ঠিক ৯ টা ১০ মিনিট এ সমাধিস্থ হয়েছিলেন । গুরুভাইইরা ভেবেছিলেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। শরীরে

যখন কোনো সার পাওয়া গেলনা,তখন কেউ কেউ বুকে হাত বোলাতে বা পদসেবা করতে লাগলেন। তাও যখন কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না ডাকা হলো ড মহেন্দ্রলাল সরকার (তখন কর দিনে Homeopathy Allopathy র দুই ডিগ্রি ধারি , নামি ,গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চিকিৎসক) কে।তিনি বললেন গলগন্ড রোগে মৃত্যু(পরে ডাক্তার বিপিন ঘোষ বলেন সন্নসযোগে সমাধি লাভ)।ভেঙে পড়লেন গুরুভাইরা বেলুড় মঠের নীচের দক্ষিণ কোন এর ঘরে। সালটা ১৯০২,৪ ঠা জুলাই। স্বামী তুরিয়ানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন কলকাতা এ।
চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই ক্রিস্টিন গৃনিস্টাবেল কে বলেছিলেন"আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি"।সেই স্বামীজি কে আমরা হইতো পুরো চিনে উঠতে পারিনি।চেষ্টাও কতটা করেছি?!সেই তিনি তাই বলে গেছেন আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে জানত এই বিবেকানন্দ কি করে গেলো।
বলেছিলেন ইস্পাতের মত স্নায়ু ও লোহার মত পেশী যুক্ত যুবক চাই যারা হবে তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুগঠিত ,বলিষ্ঠ তরুণ। যারা হবে ভারতের জন্য নিবেদিত প্রাণ,"জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত"।তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিক রোমা রোলা কে বলেছিলেন" যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দ কে জানো,তার মধ্যে নেতিবাচক কিছু নাই সব ইতিবাচক".।ভারত কে নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসতেন।কন্যাকুমারী এর একটি বড়ো পাথরে বসে যোগ মাধ্যমে আত্বউপলদ্ধী করেছিলেন ভারতের অবস্থা।যে পাথর এখন বিবেকানন্দ রক নামে পরিচিত।
ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছিল ,অতীতে যেমন বুদ্ধদেব এর ছিল বিরাট হৃদয়,চইতন্যদেবের ছিল অগাধ প্রেম ও শঙ্করাচার্য এর ছিল তীব্র মেধা ,সবকিছুর সঙ্গ মিশ্রণ ছিলেন তাঁর গুরু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।তার

আলোকে তার প্রিয় শিষ্য(swami vivekananda) এর ছিল শুকদেব এর ন্যায় ত্যাগও।

বলেছিলেন নারিজগরণের কথা।"যে রাধে সে চুলো বাঁধে" তাই অন্যান্য মনীষীদের মত তিনিও নারিজগরণ চেয়েছিলেন।(নারিজগরণ নিয়ে বেশি কিছু বললাম না পরবর্তী প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য)

এবার আসা যাক শিক্ষা প্রসঙ্গে। শিক্ষা কি? এরও উত্তর দিয়ে গেছেন স্বামীজি।বলেছেন "শিক্ষা হলো পূর্ণ জ্ঞান যা মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই অবস্থিত।" সেই শিক্ষা নীতিগত,প্রকৃতিগত; 'চলকলা ' বাধা' বিদ্যা শুধু নয় আর শিক্ষকের কর্তব্য সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা।

এটি হলো আসল শিক্ষা,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আসল উদ্দ্যেশ্য।

সে শিক্ষা হবে দুর্বলতার শিক্ষা না,আত্ত নির্ভরশীল হবার শিক্ষা।

দরিদ্র শিক্ষা, শুদ্র জাগরণ,নিপীড়িত দিগের শিক্ষা।তাইতো স্বামীজি বলে গেছেন " তোমরা বল পিতৃদেব ভবো, মাতৃ দেব ভব;আমি আরো যোগ করছি ' দরিদ্র দেব ভব ,মূর্খ দেব ভব"।

মানুষকে দেখানো হইছিল তারা অকর্মণ্য,তাই তারা ছিল পদদলিত।আমরা সকলে যে ' অমৃতের সন্তান ' তার সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে গেছেন এই মনীষী।

তিনি ছিলেন একাধারে ত্যাগী সন্ন্যাসী মস্ত সাধু ,বিরাট বিয়াপটি ছিল তার অপরদিকে, পণ্ডিত, বিশ্ব জয়ী বাগ্মী।

এই জীবন কেনো এসেছি ও আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে বলে এবং লিখে গেছেন অনেক বই।তার মধ্যে ৪ যোগ তথা কর্মযোগ,ভক্তিযোগ,রাজ যোগ ও জ্ঞান যোগ বিখ্যাত।তিনি মৃত্যুর পূর্বে ১৯০২ সালে১লা মার্চ যে কলজয়ী যন্ত্র তথা " বেলুড় মঠ " স্থাপন করে গেছেন তার স্বরূপ চিহ্ন ,প্রতীক হলো " জ্ঞানের আলোকে ৪ যোগ"।আমরা দেখতে পাই - উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ(কর্মযোগ),উদিত সূর্য(জ্ঞান যোগ), পেঁচানো

সর্প(রাজ যোগ) ও পদ্ম (ভক্তিযোগ)।আর যে হাঁসটি দেখতে পাই তা নিজ স্বরূপ ব্রহ্ম এর প্রতীক। এই চার যোগের মাধ্যমেই আমরা জীবনের সকল কাজ সমাধা ও উবলব্ধি তথা ব্রহ্ম লাভ করতে সক্ষম। অনেক কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছি কিন্তু তার মধ্যে করতে পারছি কটা? বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করতে ত আমরা জন্ম নি নাই।তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য কি!? জানেন কি? ' ব্রহ্ম লাভ ' ।

আজ পর্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, ইউনিভার্স (universe) সৃষ্টি সম্পর্কে যত তত্ব ও তথ্য বেরিয়েছে তার মধ্যে কোনোটিই সঠিক বেক্ষা দিতে পারেনি, তা পদার্থ বিদ্যার বিগ ব্যাং (Big Bang Theory) থিওরি হোক বা জীব বিদ্যার কসমিক থিওরি হোক(cosmic Theory)। আসলে এই বিশ্ব শক্তিতে ভরপুর। আলো,তাপ ,বায়ু ,জল সব এক প্রকার শক্তি বা Elimelntal power (এলিমেন্টস),পাওয়ার; প্রথমে এটি এক জোট ছিল তার পর তা বিচ্ছুরিত (scatered)হয় ও জীবজগৎ সৃষ্টি হয়।সেই সর্ব প্রথমের এক জোট হওয়া শক্তি হলো supreme power যাকে আমরা ঈশ্বর বলে জানি।

আসলে এরূপ নামকরণ আমরা করেছি আর শক্তির যেমন কোনো আকার বা আয়তন নেই তেমনি ঈশ্বরের ও তা নেই ,এটি উপলব্ধি করেছেন বড় বড় বিখ্যাত মনীষীগণ ।তাই আমাদের সুবিধার্থে আমরা যেমন অনেক কিছু করি প্রাচীন কল থেকে সেই ভাবে অনেক রূপ আমরা দিয়ে এসেছি। আমরা সেই শক্তি হতে সৃষ্টি এবং জীবনের উদ্দেশ্য সেই শক্তিতে আবার মিলন ।

কেনো আমি একে শক্তি বলছি তার অনেক ব্যাক্ষা পাওয়া যায় ।আমি যতটুকু জানি তার একটি তুলে ধরছি।রসায়নের শক্তি ও তাপগতি বিদ্যায় আমরা পড়েছি শক্তির সৃষ্টি ও ধ্বংস নেই (প্রথম সূত্র),কেবল এক মাধ্যম হতে থেকে অন্য মাধ্যম বা স্টেট(state) এ স্থানান্তরিত হয়। এবার আমাদের ভিতরের শক্তি যাকে

আমরা আত্মা ও বাইরের খোলস, চম্রস দেহ যাকে আমরা state (স্টেট) বা মাধ্যম ধরলে আমরা কি কিছু মিল খুঁজে পাবো?আপনারাই বলুন!সেই ভালো,শুভ শক্তিকেই ঈশ্বর ও খারাপ ,বাজে ,অশুভ শক্তিকে ভূত নামকরণ আমরাই করেছি,' আমাদের সুবিধার্থে '।

এবার প্রসঙ্গে আশা যাক যে যোগ ও ব্রহ্ম কী? ব্রহ্ম হলো নিজ আত্তা শক্তি যা মানুষ জন্ম থাকাই শরীরে ধারণ করে। এর ব্যাপারে স্বামীজি " পুনর্জন্ম বাদ" তত্বে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। বলেছেন - ব্রহ্ম হলো নিজ শক্তি স্বরূপ যা পূর্ণ হতেই বিরাজ মান।আর ব্রহ্ম আসলে শক্তি যা পুরো জগৎ সংসার (ইউনিভার্স) চালাচ্ছে। সেই শক্তিরই অংশ মাত্র আমরা।যে শক্তিকে আমরা আত্বা বলে থাকি সচরাচর।আত্ব ,শক্তি যাই বলিনা কেনো তার মূল লক্ষ হলো সেই পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম(suprimpower) এর সাথে মিলন(যোগ)।ত আমরা করতে পারি আর ৪ যোগে এর মাধ্যমে।

(এই যোগ এর ব্যাখ্যা APJ Abdul Kalam এর পিতা দিয়ে গেছেন তাঁর ছেলের জীবনীতে তথা Autobiography এ)। সেটি পড়লে বুঝবেন তার এক জায়গায় বলা আছে আমরা প্রার্থনা কেনো করি। যা জিজ্ঞেস করে ছিলেন ছোট্ট কালাম তার পিতাকে।জবাবে এই সকল কথার প্রাসঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কথা বলেছিলেন।

জ্ঞানের দ্বারা,ভক্তির দ্বারা,কর্মের দ্বারা ও মনন ,চিন্তন ধ্যানের দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। এটি হলো জীবনের প্রকৃত শিক্ষা।তাই ভারতের বহু মনীষীগণ বলে গেছেন যে এক জাযগায় গিয়ে বিজ্ঞান,সাহিত্য কলা,ধর্ম ও দর্শন এক, তা হলো ব্রহ্ম।আর যে সব কিছুর মাধ্যমে আমরা সেই পথ খুঁজে পাই সে পথ হলো ধর্ম।সবকিছুর ও সবধরনের ধর্মের লক্ষ এক,ব্রহ্মদর্শন।শুধু দিক আলাদা। একমাত্র হিন্দুধর্ম সেই পথ যার মূল উদ্দেশ্য হলো " আত্তার

মুক্তি প্রাপ্তি "(এর মানেই আমি হিন্দু ধর্ম কে প্রাধান্য দিচ্ছিনা কিন্তু এই ধর্ম সবচেয়ে সহজে এই পথ দেখায়)। অন্য সকল ধর্মের পথ এক হলেও
মূল উদ্দেশ্য বহু দূর ও সুদুরপ্রসারী। তাই স্বামীজিPluralism ও secularism ব্যাখ্যা করত গিয়ে বলেছেন,অন্যান্য দেশের থেকে আমাদের যা গ্রহণ করতে হবে তা হলো - শিক্ষা,রাজনীতি,অর্থনীতি,প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীদেরও 'ধর্ম সম্পর্ক ' সম্মন্ধে যা জ্ঞান আছে তা অনেক বিদেশিদেরও নেই, ত হলো প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। হয়তো তারা ধর্মের নামে অজ্ঞানতার বসবর্তি,উষ্চ জ্ঞান নেই কিন্তু যা আছে টা ভক্তি ভরে আছে। তাইতো স্বামীজি শিকাগো ধর্মমহাসভায় বলে গেছেন হিন্ধুধর্মের বিস্তারিত আলোচনা,আর বলে গেছেন" ওঠো জাগো , লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না"। তাই আমরাও আজ শপথ নি যে থামবো না। পড়বো,মচকাব তবু ভাঙবো না ,আবার উঠে দাঁড়াবো ও ' জীব জ্ঞানে শিব সেবা করব'।

|| অনুগল্প ||

" খাদ্যের সন্ধানে "

কৌশিক সিংহ

(কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ)

ঘুম ভাঙতেই একরাশ চিন্তা মাথায় ভিড় করে কিশলয়ের। কিশলয় মিত্র, বয়স ২৪। কিশলয়ের মা আর চার ভাইবোনের সংসার তাদের। বাবার মৃত্যুর পর এখন নুন আন্তে পান্তা ফুরায় অবস্থা তাদের। কিশলয় ভাই বোনের সবার বড়। তাই বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সবার প্রতি কর্তব্য দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে তার উপর বর্তায়।

কিশলয়ের বাবা অনাথবন্ধু বাবু ছিলেন একজন সৎ ব্যবসাদার। আর তার ফলস্বরূপ ওনার ব্যবসা সফলতা লাভ করেনি। ছোট একটা লোহার কারখানা ছিল ওনার। উনি ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্খী ভালোমনের মানুষ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল ওনার।

অনাথবন্ধু বাবু কোনোদিন চাননি যে তার ছেলেরা তার মতো কালিঝুলি মেখে কারখানায় কাজ করুক। তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে অনেক বড় হোক। তিনি চাইতেন তার ছেলেমেয়েরা ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া করুক শুধু।

তিনি বলতেন ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা লেখাপড়া করলে তবেই ভালো রেজাল্ট করা যায়।
কিন্তু দুঃখের বিষয় তার ছেলেমেয়েরা করতো তার ঠিক উল্টোটা!

অনাথবন্ধুবাবু উত্তর কলকাতার একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন তখন। সেখানকার পরিবেশ একপ্রকার বস্তি প্রকৃতির ছিল বলাই চলে। দু'একটি ছাড়া কোনোবাড়িতেই লেখাপড়ার চল ছিল না তেমন। খাওয়া দাওয়া আর খেলায় বেশি
আগ্রহী ছিল তারা। কিশলয় আর তার ভাই বোনেরা ছিল তাদের খেলার নিত্যসঙ্গী।
যখন তখন প্রতিবেশী বন্ধুরদের ডাক পড়তেই বইপত্তর ফেলে রেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে নাচতে খেলতে বেরিয়ে পড়তো তারা।

বছরের শেষে যখন রেজাল্ট বের হতো তখন, কেউ ফেল বা কেউ কানমাথা ঘেসে বেরিয়ে যেতো। আর যে ছেলেটি বা মেয়েটি কানমাথা ঘেসে বেরিয়ে যেতো সে পড়াশুনায়
ভালো বলে গণ্য হতো মান্য পেতো আশ্চর্য সেই পাড়াটিতে!

কৈশোরের সেই গণ্য মান্য পাওয়া ছেলে কিশলয় অনেক বছর আগেই কৈশোরকাল পার করে যৌবনে পদার্পন করেছে। শৈশব কৈশোর খেলা সব চোখের নিমেষে হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই। দেহ-মনে-প্রাণে কিশলয় আজ তরতাজা যুবক।
পেটে তার অনেক খিদে, মনে অনেক স্বপ্ন। কিশলয় এখন সারাটাদিন একটা চাকরির আর একটু খাদ্যের সন্ধানে ঘোরে । আজ সে বুঝতে পারে বাবার কথা শুনে যদি একটু ভালো করে, বেশি সময় দিয়ে মন দিয়ে

লেখাপড়াটা করে একটা চমৎকার রেজাল্ট করতে পারতো তবে, তার জীবনে চমৎকার কিছু ঘটতো এখন। কিন্তু কঠিন বাস্তবে তা ঘটে না। এখন কিশলয়ের একটা দিন যায় তো বছর যায়।

|| গল্প ||

" একটি ক্যাপ ফাটানো বন্দুকের গল্প "

গোবিন্দ মোদক

(নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ)

সব্দালপুর। মফস্বলের একটি গঞ্জ। পাকারাস্তার দু'ধারে সারি সারি ঝাঁ-চকচকে দোকান। তারই মাঝখানে একটি প্রাচীন দোকান। দোকানের সাইনবোর্ডটি ততোধিক প্রাচীন। একটু নজর করলে দেখা যায় লেখা আছে -- ভ্যারাইটি স্টোর্স। প্রোপাইটার অবনী ভূষণ ....। কিন্তু পড়া যায় না পদবীটা।

দোকানটির সামনে এসে দাঁড়ালো একটি চকচকে গাড়ি, দেখেই বোঝা যায় ডাক্তারের। একজন ডাক্তার গাড়ি থেকে নামলেন এবং সোজা দোকানের ভেতর ঢুকে গেলেন।

আরে ডাক্তারবাবু আপনি ! কে পাঠালেন আপনাকে ! শিগগির আসুন, আমার বাবা কেমন করছেন।

কই কই দেখি ! আরে ইনি তো অবনীবাবু।

আপনি আমার বাবাকে চেনেন, ডাক্তারবাবু !

হ্যাঁ চিনি। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আগে আমাকে দেখতে দিন। ডাক্তারবাবু তার স্টেথো দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করেন, তারপর সঙ্গীকে নির্দেশ দেন -- কুইক, আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো গাড়ি থেকে। তারপর তিনি অবনীবাবুকে দ্রুততার সঙ্গে একটি ইনজেকশন দেন এবং দোকানীর দিকে তাকিয়ে বলেন -- আপনি ?

আমি এনার ছেলে, অমিত।

অমিতবাবু, বাবার শরীর মোটেও ভালো নয়, এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে। কোন চিন্তা নেই, একটা ভয় ছিল, কিন্তু আমি ইঞ্জেকশন সময়মতোই দিতে পেরেছি, আশা করি এ যাত্রায় বেঁচে গেছেন, কিন্তু পরবর্তী ট্রিটমেন্টের জন্য নার্সিংহোম কিংবা হাসপাতাল ভর্তি করা খুবই জরুরী।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো।

না, ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই। আপনি ভর্তির ব্যবস্থা করুন, আমি লিখে দিয়েছি। এই আমার কার্ড। ভর্তি করে আমাকে জানাবেন। আমি গিয়ে দেখে আসব।

***   ***   ***   ***

দিন তিনেক পরের ঘটনা। অবনীবাবু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ডাক্তারবাবুর গাড়ি। অমিত আপ্যায়ন করল। ডাক্তারবাবু ভেতরে ঢুকলেন এবং অবনীবাবুকে বললেন --- আমাকে চিনতে পারছেন ? অবনীবাবু তো অনেকক্ষণ ডাক্তারবাবুকে দেখলেন, তারপর বললেন -- না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু বললেন --- বছর পঁচিশেক আগে পুজোর সময় আমার বাবা একটি ক্যাপ ফাটানো বন্দুক কিনবার জন্য আমাকে নিয়ে আপনার দোকানে এসেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন বন্দুকের দাম কত ? আপনি বলেছিলেন দাম দেড় টাকা। আমার বাবার কাছে অতো পয়সা ছিলনা যে আমাকে দেড় টাকা দিয়ে একটি বন্দুক কিনে দেন। আমার বাবা দুঃখিত মনে চলে আসছিলেন এমন সময় আপনি বললেন যে আপনি কি এই ছেলেটির জন্য বন্দুক কিনতে চাইছিলেন ? বাবা বললেন -- আমার ছেলেটি খুব মেধাবী, ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। আমি কথা দিয়েছিলাম পুজোতে ওকে ক্যাপ ফাটানো বন্দুক কিনে দেবো, কিন্তু .... ! তখন আপনি বলেছিলেন -- দাঁড়ান, আপনার ছেলে ফার্স্ট হয়েছে ? ঠিক আছে, আমার তরফ থেকে একে আমি এই বন্দুক, এই ক্যাপ এবং এই কালিপটকা উপহার দিলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনটি ঘটেছিল বটে।

আমি সেই ছেলেটি !

ওহো ! সেই ছেলে আজ ডাক্তার ! আমার কী আনন্দ হচ্ছে !

আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাকে দেখতে পেয়ে এবং সঠিক সময়ে এসে পৌঁছে আপনার চিকিৎসা করতে পেরে।

অবনীবাবু দু'হাত জোড় করে বললেন -- ভগবান অশেষ দয়ালু। নইলে ঠিক সময়ে একজন ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন কেন !

|| গল্প ||

" ভালোবাসার মান অভিমান "

অনাদি মুখার্জি

আকাশটা আজ বড্ড অভিমানী, সে তার অভিমানে জানান দিচ্ছে , দমকা হাওয়া আর অঝোর ধারা বৃষ্টি তে !
৭০ বছরের অমল বাবু মোটা ফ্রেমের চশমার কাঁচে বারবার সিক্ত হচছে সেই বৃষ্টি ফোঁটায় !
কিন্তু সেই দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ,ঝাপসা কাঁচের
আভাতে তার মনে কোনে জমে থাকা পুরানো স্মৃতি গুলো মনে পড়ে !
চল্লিশ বছর আগে কথা ,সেই তখন তরুণ যুবক ছিলো কলেজের পড়তো তখন পরমা সাথে পরিচয় হয় ! মনে পড়ে সেই দিন ও এইরকম বৃষ্টি পড়ছিলো সেই বৃষ্টি তে ভিজে যাচ্ছিলো। কলেজ ,রাস্তায় মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে শিমুল গাছের তলায় পরমা ! পরমা কে দেখে অমল ও সেই খানে দাঁড়ালো , পরমা তখন বললো কি হল খুব বৃষ্টি তে ভিজে ভিজে কলেজ যাচ্ছো! অমল মুচকি হেসে বললো অনেক দিন এই বৃষ্টিতে ভিজিনি ,বলে পরমা কেও এই বৃষ্টি মধ্যেই টেনে আনলো ,পরমা বললো কি যে করো খুব জ্বালাতন করো বলে সেই দিন ও আর পরমা

খুব ভিজেছে ! তাই আজো ও মনে হয় এই বৃষ্টিতে ভিজে নিজের মান অভিমান গুলো মুঝে ফেলতে !
কি গো শুনছো ? সেই কখোন থেকে বৃষ্টির মধ্যেই আছো ,পরে যখন জ্বর আসবে তখন কার ধকল যাবে শুনি ! খুব জ্বালাও তুমি ! অমলবাবু বৌয়ের পরমা কথা শুনে মুচকি হাসে আর মনের মধ্যেই বলে তোমাকে জালাতে খুব ভালো লাগে তাতে করে তোমার মুখ খানি আরো ভালো লাগে ! পরমা বলে আর পারি না বাপু !
পরমা নামে মানুষটি সাথে ৫০ বছরের পরিচয় ও সংসার করছে ,পরমা কে সংসারে সব দায়িত্ব দিয়েছে কিন্তু তার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করেনি আজো তাই আজ সেই অভিমান নিয়ে অমলবাবু ব'য়ে বেড়াছে !
আবার পরমা বললো কি গো বাবু তোমার পাঞ্জাবি টা ভিজে গেছে ঘরে এসে ছেড়ে নাও ,তোমার টেবিলে চা ও জল খাবার দেওয়া হলো খেয়ে নাও ! সত্যিই এই পরমা তার কত খেয়াল রাখে ,বলে অমলবাবু ঘরে এসে পাঞ্জাবি ছেড়ে জলখাবার খেতে বসে !
অমলবাবু পেশায় ছিলেন শিক্ষক ,সময়ের নিয়মে রিটায়ার করেছে ,কিন্তু তার গল্পের বই পড়া নেশা কমেনি ,চাকরির অবস্থায় যেমন বই পড়তে ভালো বাসতেন আজো ও তার বই পড়ার নেশা কমেনি ! জীবনের এই দুটি ছাড়া আর কিছুই করেননি ,সব দুই হাতে সামলেছে পরমা ! ছেলে মানুষ করা ,তাকে খাবার খাইয়ে সঠিক সময়ে স্কুলে পাঠানো ,বাজার করা ,ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসা,আবার নিজের মতোন করে ছেলের জন্য একটা বৌ পছন্দ করে বাড়িতে আনা !
কাল অমলবাবু তার পুরোনো বই গুলো বের করতে গিয়ে দেখে তার মধ্যেই একটি নীল রঙের ডায়েরি পান ,সেই ডায়েরি পাতা খুলে দেখে লেখা আছে পরমা মনের কথা ! আগে জানতো না অমলবাবু যে পরমাও ডায়েরি লেখে ,সেই ডায়েরি টা পড়ে অমলবাবু চোখের জল আসে আর তাতে তার অভিমানী মন হয়ে উঠে ! আজ আবার

ঐ ডায়েরি টা পড়বে তাই জলখাবার খেয়ে ঐ ডায়েরি টা নিয়ে শুয়ে পড়তে থাকে !
অমলবাবু এই ডায়েরি টা মধ্যেই গল্প টা পড়তে ভালোই লাগছিল পুরোনো দিনের কথা সব কিছু লেখা আছে কিন্তু ডায়েরি পাতা যত শেষ হতে থাকে তত অমলবাবু মন খারাপ হতে থাকে ,এক জায়গাতে পরমা লিখেছে যে মানুষ টা সাথে এতদিন ঘর করলাম সেই মানুষ টা আমার মনের কথা বুঝতে পারেনি ! পরমা লিখেছে একদিন বাজার থেকে ভালো নীল রঙের শাড়ি এনে আমাকে দেখালো তখন আমি বললাম এইটা বুঝি আমার জন্য তখন ঐ মানুষ টা বলে না আমার বন্ধুর স্ত্রীর জন্ম দিন তাই তাকে দেব বলে আনলাম ! ঐ মানুষ টা আমাকে সব দায়িত্ব দিয়ে ছে বলে কি আমার সব সুখ মেটে ! আমার তো ইচ্ছে হয় ঐ মানুষ টা আমাকে কোনোদিন বললো না পরমা চলো আজ পুজোর তোমার শাড়ি বাজার করি ,বা কোনোদিন হাতে করে এনে বললো না পরমা এই টা তোমার জন্যই আনলাম ! প্রতিটা বউ চাই তার স্বামী সাথে একটু ঘুরতে যাওয়া বাজার করা আনন্দ আলাদা ,কিন্তু ঐ মানুষ টা কোনো দিন তাকে একটু ও ঘুরতে নিয়ে কোথাও যাই নি ! এই দুঃখ টা আমার রয়ে গেলো মনে আজো এই ইচ্ছে পূরণ হলো না ! এই লাইন গুলো পড়ে অমলবাবু মন সত্যিই অভিমানে ভ'রে গেলো !
অমলবাবু আজ বুঝলেন পাশাপাশি একসাথে থাকলেও মানুষের মন কতটা দুরে থাকতে পারে !
তাই অমলবাবু তাদের বাড়ির কাজের লোক রঘু কে ডেকে টাকা দিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন ,রঘু চলে যেতে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন !
কি গো কি হল চলো খেয়ে নেবে এইবার দরজটা খোলো বললেন পরমা , অমলবাবু দরজা খুলে পরমাদেবীকে সামনে পেয়ে তার হাতে নতুন প্যাকেট মোড়া দুটি জামদানি নীল রঙের শাড়ি দিয়ে বললেন এই টা তোমার

জন্য ,আজ বিকেলে এই শাড়ি টা পরবে আর আমার সাথে বাজারে যাবে ! এই কথা শুনে পরমা খানিকটা লজ্জা পেয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে তার বৌমা দাঁড়িয়ে আছে ! ছেলের বৌমা দেখে অমলবাবু বললেন বৌমা আজ আমি আর তোমার শাশুড়ি মা বাইরে রেষ্টুরেন্টে খাবো আর বিকেলেপার্কে গিয়ে একটু গল্প করবো ! এই কথা শোনার পর পরমা তার মনের মানুষ টা দেখে আর ভাবে সত্যিই মানুষ টা খুব ভালো আমি চাই না কিছু শুধু একটু ভালো বাসার পরশ চাই তাতে আমার অভিমান দুর হয় ! বলে পরমা অমলবাবু কে টেনে নিয়ে গেলো খাবার খাওয়াতে ! অমলবাবু ও বুঝলেন ভালো বাসা দিলে হয় না তার মনের ইচ্ছে গুলো চেনা দরকার !

|| গল্প ||

" হানাবাড়ির হাহাকার "

কল্পেশ মান্না

(হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ)

-মুকুন্দপুরের নাম শুনেছিস কোনদিনও?
-না তো। কোথায় সেটা?
-আসানসোল ছাড়িয়ে আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার বাসে করে যেতে হয় সেই জায়গায়।
-বুঝলাম।

বর্ষার এই সন্ধ্যেতে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাটে আড্ডা বসে রোজই। কলেজ জীবনের তিন বন্ধু। রবি, রনি, রাজু এই হলো এই আড্ডার তিন মূল উপাদান। সঙ্গে উল্টোদিকের ভবেশের দোকানের চানাচুর আর লঙ্কা মাখানো ঝালমুড়ি আর তেলেভাজা, বেগুনি। লোডশেডিংও এসবের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায় বৈকি মাঝেসাজে।
নাম শুনে মনে হলেও ওরা তিন ভাই নয় মোটেই। আর সত্যি বলতে ওই তিনটে ওদের ডাকনাম বৈকি আর কিছুই নয়। আসল নামগুলো অব্যক্তই রাখলাম এই গল্পের জন্য।
এই মুহূর্তে কলকাতায় থাকলে ওরা কেউই এই শহরের আদি বাসিন্দা নয় মোটেই। প্রত্যেকেরই এখানে আগমন ছাত্রজীবনে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পড়ার

সুবাদে। তবে বর্তমানের চাকরিসূত্রে প্রত্যেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।
কলেজ শেষ হয়ে গেলেও ওদের বন্ধুত্ব কমেনি এক ইঞ্চিও। তাই সুযোগ সময় পেলেই তিন মাথা এক হয় মাঝেমাঝেই। আজও সেই রকমই একটা দিন। কারেন্টও চলে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। বাইরে থেকে জানলার শার্শির ওপর পড়া বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো নেমে যাচ্ছে কাঁচের গা বেয়ে। ভূতের গল্পের জন্য তাই বেশ জমে উঠেছে এই পরিবেশটা।

-সেখানে কবে গিয়েছিলি তুই? মুখের ভিতর একমুঠো ঝালমুড়ি চালান করে প্রশ্ন রনির।
এই ভিজে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এই ঝালমুড়ি যেন অনেকটা আঠার মতন কাজ করে। দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন অন্ধকার পরিবেশে দৃঢ়তর করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক উপাদান এটি।
-২২ শে ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে। কলেজ শেষ হওয়ার দু'বছর পর।
-ওখানে কি করতে গিয়েছিলি তুই? জানলার দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে প্রশ্ন রাজুর।
-সেটাই আজ তোদেরকে বলব ভাবছি এখন। বুঝলে বন্ধুগণ?
-তাহলে আর দেরি কেন। শুরু কর।
-হুম্।

(বাকি গল্পটা রবির নিজের প্রথম ব্যক্তিতেই বলবো। কারন ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে তাতে নাকি পাঠকেরা ঘটনাবলীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি ও আগ্রহ প্রদান করেন। যাইহোক।)

-কলেজ পাশ করে আমি তখন হেন্য হয়ে চারিদিকে চাকরির খোঁজ করছি। রাজু ততদিনে চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু রনি, তুই তখনও পাসনি চাকরি।
যাই হোক, এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যেন ওই জায়গাটার নাম পেয়েছিলাম। খবরের কাগজেই সম্ভবত, "কর্ম খালি" বিজ্ঞাপনের পাতায়।
সরকারি কাজ, বুঝলি? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। আসানসোলের কাছাকাছি এক বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা, কাজও ওখানে থেকেই।
-মাইনেও ভালোই। তাই আর বেশি দোনোমন না করে তল্পিতল্পা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুদিন পরেই। হাওড়া থেকে আসানসোল অব্দি ট্রেনে গিয়ে তারপর সেখান দিয়ে বাস ধরে আরো ঘন্টাখানেক এর রাস্তা।
যাই হোক সেখানে গিয়ে দেখি বাংলোর সরকারি অফিসার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছু কথাবার্তা বলে আমাকে বাংলোর যাবতীয় কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়েই তিনি তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরেই।
-তেপান্তরের পাড়ে একা থাকতে হবে ভেবে কিছুটা দোনোমন হচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু এত ভাল মাইনে এতো আরামের কাজ তখন আর কোথায় পেতাম বল?
-যাই হোক, আগের অফিসার চলে যেতেই আমিও স্যুটকেস থেকে আমার সব জিনিসপত্র বের করে ভালো করে গুছিয়ে বসলাম সেই বাংলোয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা উঁচু টিলার মাথায় ছিল সেই বাংলোটা। একতলা হলেও বাইরে জানলা দিয়ে নিচের গোটা গ্রামটা ধানক্ষেতের জমি আর সুবর্ণরেখা নদী দেখা যেত সবটাই।
-যাই হোক, জায়গা অতটাও খারাপ ছিল না। দুদিন যেতেই বেশ ভালো করেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানকার সবকিছুই। খাবার-দাবার মন্দ নয় কারণ বাংলোর নিজের বাবুর্চি ছিল, যে থাকতো ওই গ্রামেই।

-বেশ ভালোই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা খবর পেয়ে তছনছ হয়ে গেল আমার রোজকার জীবন। গ্রামের পূবপাড়ার এক ছেলে নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলের ভিতরে পোড়োবাড়িতে খেলতে গিয়ে। -পুলিশ-কাছারি করে গ্রামের লোকজন সবাই মিলে দিনরাত এক করে সপ্তাহখানেক খুঁজেও খুঁজে পেল না তার বিন্দুমাত্রও। ছেলের মা তো ততদিনে কেঁদেকেটে অস্থির। তার ছেলেকে নাকি রায়বাড়ির দানোয় টেনে নিয়ে গেছে। ফেরত পাওয়ার নাকি আর কোনো আশা নেই তার। তার ব্যাখ্যা গ্রামের অনেকে মেনে নিলেও কলকাতা শিক্ষিত আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে একটু বেশিই সময় নিয়েছিলাম।

-একে ওকে জিজ্ঞেস করে যতটুকু জানলাম তা থেকে বুঝতে পারলাম জঙ্গলের ভিতরের পোড়ো বাড়িটার মালিক নাকি একসময় ছিলেন এখানকার জমিদার রায় পরিবার। কালের স্রোতে আর আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে বংশ আর ভিটেমাটি, দুইই বিলুপ্ত হলেও প্রেতাত্মার মতন এখনো নাকি দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ভেতর তাদের পুরোনো বাড়িটা। সন্ধে তো দূরের কথা, দুপুরের দিনের আলোয় ওখানে যেতেও নাকি পা কাঁপে এখানের জোয়ান সাহসী ছেলেদের।

-রহস্যের সমাধানের জন্য তাই মনস্থির করে ফেলেছিলাম আমি। গ্রামের অনেকে বারন করলেও আমি ছিলাম নাছোড়বান্দা। এমনিতেই ছোটবেলা থেকেই ভয়ডর আমার একটু কমই ছিল। তার ওপর ভূত দেখার আগ্রহ পুষে রেখে ছিলাম তখন থেকেই। এমন মোক্ষম সুযোগ তাই আর হাতছাড়া না করবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

-শ্রাবণ মাসের শেষের শনিবার অমাবস্যা পড়েছে দেখে সেদিনই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সমেত ব্যাগপত্র রেডি করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। তাই আর দেরি না করে দুগ্গা

দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম সেই পোড়োবাড়ির উদ্দেশ্যে সেদিন সকালেই।

-এখানে আজ আসবো বলে এর আগেও দুদিন এসে দেখে গেছি পুরো তল্লাটটাই। শালবনির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে তারই একটা শাখা এসে থেমেছে এই বাড়ির সিংহ দরজার ঠিক সামনে। বাইরে থেকেই প্রথম নজরেই বলে দেয়া যায় বাড়ির বয়স অন্তত দুশো বছর। দেখভালের অভাবে এখন ভগ্নপ্রায় হলেও এক সময় যে এই স্থাপত্যের জৌলুস ছিল যথেষ্ট তা আন্দাজ করা যায় ভালোকরেই। সিংহদরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই এক সময়ের কারুকার্যময় সুন্দর বাগান এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং তার মাঝে শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল বড়ো পরীর ফোয়ারা।
-চারপাশের বাগানে হওয়া জঙ্গলে আগাছার কাটা বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি মূল দরজার দিকে। এখন ফোকলা বুড়োর দাঁতের মতন হাহা করে ফাঁকা থাকলেও এখানেই যে একসময় ছিল বাড়িতে প্রবেশের মূল দরজাটা তা নিয়ে আমার তখন সন্দেহ ছিল না কোনো। যাইহোক সেটা পেরিয়ে প্রাসাদপ্রমোদ বাড়িটায় ঢুকতেই দেখলাম দুপাশে সারি সারি দেওয়া অসংখ্য ঘর। কতোগুলোর দরজা আছে, বাকিগুলোর নেই। দালানের মাঝে উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে বিশাল ঝাড়লন্ঠনের ভগ্নাবশেষ। আশে পাশে পড়ে থাকা আসবাবপত্রের চেহারা দেখে মনে হলো এককালে এই বাড়ির বৈঠক ছিল যথেষ্টই।
যাইহোক সন্ধে হতে বেশি সময় বাকি ছিল না আর ঘড়ির কাঁটায়। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঠিক করলাম চারপাশে জায়গাটায় একবার চক্কর মেরে আসি। যেই কথা সেই কাজ, এই ভেবে কাদের ব্যাগটা খুলে একটা ছেঁড়া সোফার উপর রেখে সঙ্গের টর্চটা বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়লাম তাই বাড়ি ছেড়ে আশেপাশের ছড়িয়ে থাকা বাগান চত্বরে। মিনিট পনেরো

টর্চ হাতে কি যে খুঁজলাম কে জানে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য পেলাম না কিছুই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে বাধ্য হয়েই তাই ফিরে এলাম সেই বাড়িতে।

-দরজা বেরিয়েই বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই কেমন যেন উসখুস করে উঠলো মনটা। একা আছি তাই ভয় লাগছে, এই ভেবে কিছুক্ষণের জন্য সেই চিন্তাটাকে থেকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম তাই। কিন্তু হঠাৎই যেনো কিসের একটা সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলো মনের ভিতর। কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠলো মগজের মধ্যে, এখানে আমার চলে যাওয়ার পরেও এসেছিল কেউ একজন। তার উপস্থিতি এই মুহূর্তে চোখে না পড়লেও তারপর অস্তিত্বের আভাস যেন কোনো এক মাধ্যমের সাহায্যে আঁচ করতে পাচ্ছিলাম আমি।
-এই সব সাত-পাঁচ ভেবে হঠাৎ করেই কি যেন কারণে ব্যাগের দিকে তাকিয়েই ছ্যাঁত করে উঠলো বুকটা। চেনটা খোলা! কে খুলল?! হৃদস্পন্দনের গতি যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না তার আর একটুও। ওই ব্যাগের চেন যে খোলা থাকার কথা নয় এবং সকালবেলা এখানে আসার আগে আমি নিজেই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ওতে ঢুকিয়ে চেন টেনে দিয়েছিলাম তা নিয়ে সন্দেহ নেই আর কোনো। একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাগের ভেতরটা আরেকটু ভালো করে দেখতেই বুঝলাম আগন্তুক কোনো বিশেষ কিছুর সন্ধানেই তা নিয়ে সন্দেহ নেই কোনো।
-কিন্তু কি? আজকের রাতের মধ্যেই তার উত্তরটা জানতে পারব আশা করি। যাই হোক সেই মুহূর্তের জন্য বাঁচবার তাগিদেই বোধহয় পকেট থেকে দেড় ব্যাটারির টর্চটা বের করে জ্বেলে বসলাম আমি।
হঠাৎ করেই জানলায় টাঙানো লম্বা ছেঁড়া কাপড়গুলোর পিছন থেকে, পুরোনো পর্দাই মনে হয় কি যেন একটা মূর্তি সড়াৎ করে সরে যেতে দেখলাম। এখানে রাতটা

একা কাটবে না ততক্ষণে ভালো করেই বুঝে গিয়েছিলাম আমি। এই ঘর ছেড়ে তাই দুতলায় গিয়ে একটা ঘরের বিছানায় গিয়ে গুছিয়ে বসলাম আমি।
-আগন্তুকের আসার অপেক্ষায় অনেকখানি জেগে বসে ছিলাম আমি। কিন্তু রাত বাড়তেই বিস্কুট খেয়ে ভরা পেটে কখন যে ঘুম ধরে এসেছিল তার খেয়াল ছিল না আর।
-হঠাৎই খুট করে কি যেন একটা আওয়াজ হলো বাইরের দালানে। ঘুমটা ভেঙে কানগুলোকে সতর্ক করতেই বুঝলাম কারোর হেঁটে যাওয়ার শব্দ সেটা। গায়ের ওপরের চাদরটা আস্তে করে পাশে সরিয়ে রেখে বালিশের নিচে থেকে টর্চটা বের করে সেদিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো একখানা অদ্ভুত দৃশ্য।

-একটা বিড়াল, অন্ধকারে তার গায়ের রংটা ঠিক করে ঠাহর হলো না আমার; কিন্তু মনে হল সাদা বলেই, হেঁটে যাচ্ছে ব্যালকনির পাশ বেয়ে। আর তার গতিপথের দিকে নজর রেখে বুঝলাম সেটা চলেছে আমার ঘরের পাশে দুটো ঘর ছেড়ে আরেকটা ঘরে। আর অদ্ভুতভাবে ঘরটার ভেজানো দুটো দরজার মধ্য দিয়ে একটা অদ্ভুত হলুদ রঙের ক্ষীণ আলো যেন এসে পড়ছে ব্যালকনির বারান্দায়।
-বিড়ালটার পিছুপিছু গিয়ে ঘরের দরজার পাল্লাদুটো ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়লো আর এক অদ্ভুত দৃশ্য।
-এক বৃদ্ধ; মুখ দেখে মনে হল বয়স সম্ভবত আশির ঊর্ধ্বে, ঘরের এক কোনার দিকে জানলার নিচে মাটিতে আসন পেতে কি যেন লিখছেন। সামনে একটা একটু নিচু টেবিলের ওপর খোলা একটা বড়ো আদ্দিকালের দিস্তা খাতা, তার ওপরেই পায়রার পালকের তৈরি কলম ধরা একটা সরু শীর্ণকায় হাত ওঠানামা করছে ক্রমশ, পাশেই রাখা কালির দোয়াতের ছোট্ট একখানা কাঁচের শিশি।

তার পাশে জ্বলছে একটা ক্ষয়াটে বেঁটে মোটা মোমবাতিও, দালানে পড়া আলোর উৎস সম্ভবত। আর তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো আমার সেই ঘরে প্রবেশ সে আদেও বিচক্ষণ করেননি।
-নিঃশব্দে ধীরপায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ করে চোখের পলকেই আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল একটা। আমার পিছু পিছু দালানের বেড়ালটা যে কখন এসে ঢুকেছে ঘরে তার আন্দাজ করতে পারিনি আমি তখনও।
-কিন্তু হঠাৎ করেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার টেবিলে উপর লাফ দিয়ে উঠে বসলো সেটা। সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনেই ঘটে গেল বিশাল বিপর্যয়। দোয়াতের কালি উল্টে গিয়ে ছলকে পড়লো লেখকের দিস্তা খাতায়, মোমবাতিটাও নড়ে গিয়ে গড়িয়ে গেলো টেবিলের উপরে রাখা কাগজের ওপর।
-প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবধারিত অগ্নিকাণ্ড, ফাস্ করে জ্বলে উঠলো কাগজটা আর লেখককের হাত বেয়ে তার গায়ের কাপড়েও। এতক্ষণে বোধহয় হুঁশ ফিরলো লেখনীতে মগ্ন বৃদ্ধের; নিশুতি রাতের অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়ে ফাটা গলায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি, হুড়োতাড়া করে মেঝেয় নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ে গায়ে চাদরটা ছেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন।
-কিন্তু সবই বৃথা। দেরি হয়ে গিয়েছিল বড্ড; চোখের সামনেই জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে যেতে দেখলাম অসহায় সেই বৃদ্ধকে। এই পৃথিবীতে তাঁর এই অস্বাভাবিক অবস্থান অদ্ভুত হলেও তাঁর যন্ত্রণা বুঝবে এতোটুকু কষ্ট হচ্ছিল না হতভম্ব আমারও।

-কিন্তু অবাক হতে তখনো বাকি ছিল আমার, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হঠাৎ করে বুঝলাম বৃদ্ধের বীভৎস আর্তনাদ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে একটা অন্য কিছুতে।
-হাসি! রক্ত জল করা সেই হাসি। আমি ভুলবো না কোনদিনও।

-সেই সঙ্গে এক বীভৎস দৃশ্য, জ্বলন্ত বৃত্ত হাসতে হাসতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে দরজার কাছে।
-আর্তনাদ করে আমি পিছু ফিরে দ্রুত আমার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে আমার ব্যাগটা খুঁজে পেয়ে সেটার ভিতরটা হাতড়াতে থাকলাম। কিন্তু না...!
-ওটা নেই! সেই জিনিসটা নেই! যার ভরসায় আমার এখানে আসা, এত সাহসী আমি যেই কারনে ছিলাম, সেই বস্তুটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে আমার ব্যাগ থেকেই।
-এবার আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম বিকেলে কে খুলেছিল আমার ব্যাগটা আর কেন। আর রক্ষে নেই আমার কোনো আজ এখানে এই বিভীষিকার হাত থেকে। দরজায় টোকা পড়ছিল অনেকক্ষণ থেকেই, এবার সশব্দে চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে গেল সেটা।
-দরজার ওপাশে যে মূর্তিটাকে দেখলাম তাকে দেখলে মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবে যে কোনো সাধারণ মানুষই।
-সেই অথর্ব বৃদ্ধ; দীর্ঘ জ্বলনের পর খসে পড়ছে তার মুখ, গালের মাংসগুলো, চোখের কোটর খালি। অন্ধকারে ভরা! ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।
-আরেকটু কাছে আসতেই পেলাম গায়ের পোড়া মাংসের বীভৎস উৎকট অসহ্যকর গন্ধ, কোমরের কাছে ঝোলা এতোটুকু কাপড়ে তখনও জ্বলছিল আগুনের শিখা।
-ব্যাস তারপরেই কি যে হলো তার কিছুই মনে নেই আমার আর। ঘুম ভাঙলো বাঁকুড়া জেলা সদর হসপিটালে। পরে জানলাম আমার দেহ নাকি পাওয়া গেছে ওই পোড়োবাড়ির ভিতর থেকে, কিছু গ্রামের লোকেদের সাহায্যে।
-সাহস করে আর কোনোদিনও ফিরিনি ওই জায়গায় আমি।

-সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাগের মধ্যে কি জিনিস খুঁজছিলি তুই? যেটা ওখানে নিয়ে গিয়েছিলি। বললো রনি।
-ভালো প্রশ্ন। দাঁড়া দেখাচ্ছি তোদেরকে। বলে চেয়ারের ওপর রাখা ব্যাগটার দিকে এগিয়ে গেল সে।
ব্যাগটা খুলে একটা জিনিস নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলো রবি। কিন্তু জিনিসটা দেখেই ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল ওদের।
সেটা যে একটা গলার হার; কিন্তু তাতে ঝুলছে একটা আস্ত কাটা আঙ্গুল, এবং সেটা যে মানুষেরই তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কোনো।
অজ্ঞান হওয়ার আগে রনি আর রাজু, রবির গালের গলে যাওয়া মাংস খসে হাড় বের করা মুখটাকেই দেখেছিল শেষ পর্যন্ত।

পরে জেনেছিলো ওরা, রবি মারা গেছে প্রায় বছর পাঁচেক আগে। তাহলে কার বাড়িতে সেদিনকে চপমুড়ি খেতে গিয়েছিল ওরা আর এত বড়ো অদ্ভুত গল্প কে শোনালো তাদের, তার উত্তর এখনো অজানাই রয়ে গেছে তাদের কাছে।

" ঘুরে এলাম আরাকু উপত্যকা "

দেবী প্রসাদ ত্রিপাঠী

(মেদিনীপুর, পশ্চিম বঙ্গ)

অনেকদিন থেকেই পরিকল্পনা করছিলাম মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ দেখতে যাবার, কিন্তু যে কোন কারনেই হোক যাওয়া হয়ে উঠছিল না। অবশেষে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ও আমার ভ্রমণ সঙ্গী, জীবন সাথী সুমিতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য ছিল মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ দেখতে যাবার, তার সাথে উপরি হিসাবে আরও দু-তিনটি জায়গা দেখা হয়ে গেল। প্রথমে আরাকু, ভাইজাগ এবং তারপরে মল্লিকার্জুন ও হায়দ্রাবাদ।

২০২০ সালে করোনার শুরু হওয়ার ঠিক প্রাক মুহূর্তে ২রা ফেব্রুয়ারি আমি আমার স্ত্রী ১২৬৬৩ নম্বর হাওড়া–তিরুচিরাপল্লী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচের সওয়ারী হয়ে খড়্গপুর জংশন থেকে বিকেল ৫–৫৭ মিনিটে আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থল বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। উভয়ই বয়োঃজ্যেষ্ঠ নাগরিকের সুবাদে ভারতীয় রেল আমাদের দুটি নিচের বার্থ দিয়েছিল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ট্রেনটি সময়সূচির থেকে দেরিতে যাচ্ছিল। ভোরবেলা সঠিক সময়ে বিশাখাপত্তনমে পৌঁছাতে পারবো কিনা এই চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। ট্রেন যথারীতি রেলের সময়সূচী মেনে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই অর্থাৎ ভোর ৫–২৫এ বিশাখাপত্তনমে পৌঁছালো। এখান থেকে আমাদের গন্তব্য স্থল আরাকু। দুদিনের প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেদের কাছে রেখে বাকি জিনিসগুলি রেলের ক্লোক রুমে রেখে দিলাম। আমাদের এবারের ভ্রমনসূচী অনুযায়ী প্রথমে আমরা যাব আরাকু। ওখান থেকে ফিরে বিশাখাপত্তনমের দর্শনীয় স্থান দেখে শ্রীশৈলমে যেয়ে মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করবো এবং সবশেষে শ্রীশৈলম থেকে হায়দ্রাবাদের দর্শনীয় স্থান দেখে বাড়ি ফেরা। বিশাখাপত্তনম থেকে সকাল ছটা পঞ্চাশের ৫৮৫০১ নম্বর বিশাখাপত্তনম–কিরান্ডুল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একেবারে পেছনের executive coachএর সওয়ারী হলাম। ২০১৯ সাল থেকে এই ট্রেনে এই কোচটি সংযোজিত হয়েছে। কোচটির বিশেষত্ব কাঁচ দিয়ে ঘেরা, মেঝেতে কার্পেট পাতা, বসার চেয়ারগুলি বিমানের সীটের অনুরূপ যাতে প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটকেরা স্বাচ্ছন্দ্যে ৪৭২ কিলোমিটার যাত্রাপথে পাহাড়, বনানী, ঝরনা, অসংখ্য টানেলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ অনুধাবন করতে পারেন। যাইহোক ৬–৫০ মিনিটের পরিবর্তে সাতটা কুড়ি মিনিটে ট্রেনটি ছাড়ল। ২৬–২৭ কিলোমিটার যাবার পরে পাহাড়,

জঙ্গল, টানেল শুরু হল। জানালার ধারে বসে আমরাও একের পর এক ছবি মোবাইলে তুলতে লাগলাম। এই প্রসঙ্গে বলি ১৯৬৬ সালে এই রেলপথের যাত্রা শুরু হয়েছিল জাপানের সাথে রপ্তানির চুক্তি অনুযায়ী বাইলাডিলা খনির লৌহ আকরিক বিশাখাপত্তনম বন্দরে পৌঁছানোর জন্য। গর্বের কথা এই রেলপথের রূপকার ছিলেন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পি,কে, ঘোষ। বর্তমানে পুরো রেলপথটি বিদ্যুৎচালিত কিন্তু সিঙ্গেল লাইন। এই রেলপথে ৫৮টি টানেলের মধ্যে দীর্ঘতম টানেলটি এক কিলোমিটার দীর্ঘ যেটি ৩৫ এবং ৩৬ নম্বর টানেলের সংযুক্তিতে। সর্বোচ্চ স্টেশনটি ৯৯৬ মিটার (৩২৬৮ ফুট) উচ্চতায়, মেঘ ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন সিমিলিগুডা- আরাকু থেকে ৬ কিলোমিটার আগে এবং বিশাখাপত্তনম থেকে ১১৯ কিলোমিটার দূরে। এই রেলপথের অজস্র টানেল, পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য এককথায় অনবদ্য। ভ্রমণার্থীদের উচিত হবে এই রেলপথে যেয়ে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করা। আমাদের ট্রেনটি পথিমধ্যে আরো দেরী করার জন্য নির্ধারিত সময়সূচির একঘন্টা পরে আরাকুতে যেয়ে পৌঁছালো দুপুর ১২ টায়। ওড়িয়া ভাষাতে আর্কু মানে লালমাটির দেশ, মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। তাপমাত্রা শীতকালে ৪ ডিগ্রি এবং গ্রীষ্মকালে ৩৪ ডিগ্রি। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৭০০ মিলিমিটার। আরাকুকে অন্ধ্রপ্রদেশের উটি বলা হয়। পাহাড়ের বুকে উচ্ছল ঝর্না, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বনাঞ্চল, জলপ্রপাত, মনোরম আবহাওয়া আরাকুতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, নৃতত্ত্বের উৎসাহী পর্যটকদের এক আদর্শ স্থান।

স্টেশন থেকে একটি অটো করে তিন কিলোমিটার দূরে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন বিকাশ নিগমের ময়ুরী রিসর্টে পৌছালাম। ওখানে গিয়ে আমরা একটি cottage পেয়েছিলাম যেখান থেকে আরাকু ভ্যালি সম্পূর্ণ দৃশ্যমান। পাশেই কফি মিউজিয়াম এবং পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে আদিবাসী মিউজিয়াম। বিকেলে আদিবাসী মিউজিয়াম দেখতে গেলাম যদিও এখানকার ঐতিহ্যপূর্ণ 'ধিমসা' নাচ দেখতে পেলাম না। কারণ সপ্তাহে শনি ও রবিবার ব্যতীত অন্যদিন এই নাচের প্রর্দশনী বন্ধ থাকে। কফি মিউজিয়ামে বিভিন্ন প্রকারের কফি তৈরির প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের চকলেট তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে পেলাম এবং বাড়ির জন্য কিছু চকলেট এবং দু-তিন প্রকার প্রবাদের কফি কিনলাম।

পরেরদিন স্নান করে 'কম্প্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট' করে একটি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম - গালিকোন্ডা, থাটিগুডা জলপ্রপাত, কফি প্লান্টেশন এবং সবশেষে বোরাগুহা দেখে বিশাখাপত্তনমে ফিরে যাওয়া। আরাকু উপত্যকা ইউক্যালিপটাস, সিলভার ওক এবং পাইন গাছ এবং দূরে পাহাড়শ্রেনী দিয়ে ঘেরা প্রকৃতির এক

অনবদ্য সৃষ্টি। আরাকু থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে ১৭০০ মিটার উচ্চতায় গালিকোন্ডা পাহাড় শীর্ষ মেঘ ও কুয়াশায় ঘেরা। যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে শুধু মেঘ আর কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই - দু হাত দূরেরও কোন জিনিস দেখা যাচ্ছেনা। মিনিট পনেরো এখানে থেকে এর পরে গেলাম কফি প্লান্টেশন দেখতে। প্রকৃতির নিজের হাতে লালিত পাহাড়ের ঢালে ব্যাপকহারে কফির চাষ দেখে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল। যদিও স্বাদে ও গন্ধে নীলগিরি অঞ্চলের কফি উৎকৃষ্ট। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে ব্রিটিশের হাত ধরে এখানে কফি চাষের শুরু। আরাকু উপত্যকার প্রধান বাণিজ্যিক ফসল এই কফি। কফি গাছে থোকা থোকা লাল রঙের কফি বীজ ঝুলে আছে। স্মারক হিসেবে কয়েকটি কফি বীজ গাছ থেকে নিলাম। এর পরের গন্তব্যস্থল থাটিগুডা জলপ্রপাত। গালিকোন্ডা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে মূল সড়ক থেকে এক কিলোমিটার ভেতরে যেতে হয়। শীতের দিন বলে জলের ধারা কম। এর পরের গন্তব্য স্থল ১২ কিলোমিটার দূরত্বে বোরাগুহাতে পৌছালাম দুপুর ১২টাতে।ওড়িয়া ভাষাতে বোরা শব্দের অর্থ গর্ত এবং তেলেগু ভাষাতে গুহালু শব্দের অর্থ গুহা। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গুহার নাম বোরা গুহালু। রেল স্টেশনের নামও বোরা গুহালু। রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব এক কিলোমিটার। বোরা গুহা প্রকৃতির এক অপূর্ব ও অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভূবিজ্ঞানী উইলিয়াম কিং জর্জ ১৫০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন এই গুহা আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চুনাপাথর মিশ্রিত জল গুহার ভিতরে চুইয়ে পড়ে স্ট্যালাকটাইট এবং স্ট্যালাগমাইটস-এর মিশ্রনে ভারতবর্ষের গভীরতম প্রকৃতির হাতে গড়া স্থাপত্যকলার স্বপ্নপুরী, বাতাসহীন রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা গুহাটি ২০০ মিটার লম্বা। যে সমস্ত গুহাচিত্র এখানে দেখা যায় তারমধ্যে শিব-পার্বতী শিব-কামধেনু,

মা-ও-শিশু, মানুষের মস্তিষ্ক এবং কুমির উল্লেখযোগ্য। গুহার উপর দিয়ে রেল পথ চলে গেছে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদেরা এই গুহার ভিতরে খননকার্য চালিয়ে যেসকল পাথরের তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস এবং অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন সেগুলি অন্তত ৩০ থেকে ৫০ হাজার বৎসরের প্রাচীন এবং প্রমাণ করেছেন এখানে মানুষের বসবাস ছিল। গুহার ভিতরে প্রাকৃতিক যে শিবলিঙ্গ আছে সেখানে স্থানীয় আদিবাসীরা এখনও শিবরাত্রির দিনে তাদের উপাস্য দেবতার পূজা করেন। এই গুহার ভেতর থেকে গোষ্ঠানি নদীর উৎপত্তি। পাহাড়, জঙ্গল, সমতলভূমি পেরিয়ে বিশাখাপত্তনম থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে ভিমুনিপত্তনমে যেয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গুহার প্রবেশ দ্বারে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে ১১৮টি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে গুহার নিচে নামলাম। দর্শনার্থীদের জন্য গুহা সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিভিন্ন রঙের আলোর প্রতিচ্ছরণে গুহাচিত্র গুলি আধিভৌতিক পরিবেশে অপূর্ব। চিন্তা করে আশ্চর্য হতে হয় যে ৩০ থেকে ৫০ হাজার বৎসর আগে সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল। গুহা থেকে বেরিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ডাইনিংয়ে লাউঞ্জে দুপুরের খাবার পর্ব শেষ করে আমরা আড়াইটা নাগাদ বোরা গুহালু রেলস্টেশনে চলে এলাম। এখান থেকে আট কিলোমিটার দূরে কাটিকি জলপ্রপাত - সময় অভাবে এবং যাতায়াতের দুরগম্যতার জন্য দেখা হলো না। আমাদের বিশাখাপত্তনমে ফেরার ৫৮৫০২ নম্বর প্যাসেঞ্জার ট্রেন বিকাল ৪-৪৫এ। দু'ঘন্টা দেরি করে ট্রেন এল সন্ধ্যা ৬-৪৫ এ। পথিমধ্যে আরও দেড় ঘন্টা দেরি করে ট্রেন বিশাখাপত্তনমে এসে পৌছালো রাত্রি ১১-১৫তে। ক্লোক রুম থেকে জিনিসপত্র নিয়ে অটো করে রাত্রি বারোটাতে বালাজি রোডের ভারতীয়

স্টেট ব্যাংকের অবকাশ গৃহে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হলাম।

।। অনুগল্প ।।

" নামতা "

শম্পা সাহা

(নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ)

বৃষ্টিটা কিছুতেই ধরছে না।আকাশ ফুটো হয়েছে যেন।দুখী ঘোষ,বৌ বিনতাকে ডেকে বললো
-এক কাপ আদা দিয়ে জমিয়ে চা করো তো
-এই তো সকাল বেলা খেলে
-তো কি?করো আরেক কাপ

দুখী ওদের একতলা বাড়ির বারান্দায় ওঠবার লাল সিমেন্টের সিঁড়িতে দুই পা নামিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরালো। সুভাষ হালদারদের বাড়িতে আজ রং করতে যাওয়ার কথা।সেও হেঁটে বেশ মিনিট কুড়ি।মেয়ের সবুজ সাথীতে পাওয়া সাইকেলটাও সামনের দিকটা তুবড়ে গেছে।সেদিন এক মাতালের মোটর সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কায় এই কান্ড।মনে মনে সেই বাইক আরোহীকে আরেকবার গাল দেয়।

কানে গোঁজা বিড়ি দু বার ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়ে ঘুরিয়ে ধরালো দুখী।সামনের রান্না ঘরে বৌয়ের তিরিশটাকা শ' চায়ের ফুটে আদার গন্ধ মিশিয়ে বেড়ে লাগছে কিন্তু।আজ কাজে না গেলেই নয়।সামনে পুজো।ছেলে মেয়ে দুটোকে তো কিছু দিতে হবে ,বৌটাও আছে।

ছেলে রন্টু দুলে দুলে নামতা মুখস্থ করছে
- দু এক্কে দুই ,দুই দুগুণে চার।
মেয়েও পাশেই বসেছে।কিন্তু কেলাস টেন !সে কি আর ভাইয়ের মতন জোরে জোরে পড়বে?

দুখীর হঠাৎই মনটা খারাপ করে উঠলো।বাবা ছিল চাষাভুষো মানুষ, কিন্তু বড় শখ ,ছেলে মানুষের মত মানুষ হবে,লেখাপড়া শিখবে,মা বাবার দুঃখ দূর করবে।বাপ মায়ের দুঃখের দিনে জন্ম বলেই তো ওর নাম দুখী।

বাপটা হঠাৎ সাপের কামড়ে মারা গেল।ব্যস!সব উল্টো পাল্টা। মায়ের লোকের বাড়ি কাজ করায় পেট চলে কিন্তু লেখাপড়া?তখন তো আর এত চালডাল,বই খাতা "ফিরি"তে দিত না ,ইস্কুল "ডেরেস" ও না।হয়তো বিরাট কিছু না হলেও একটা পাশ তো দিতেই পারতো দুখী ঘোষ।বাপের মন না রাখতে পারলেও মুখ তো রাখতে পারতো।
-ধুর শালা এই বৃষ্টির দিনগুলোই হতচ্ছাড়া! যত সব আজেবাজে কথায় মন খারাপ করে দেয়!
দীর্ঘশ্বাস আর কার ওপর যেন নিষ্ফল রাগে আধ খাওয়া বিড়িটা শান করা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দুখী ঘোষ।

বিনতা একটা স্টিলের থালায় দুকাপ চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট নিয়ে এসে সামনে বসলো।বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।চা-টা ঝপ করে খেয়েই বের হতে হবে।

দুখী ঘোষ হাতে একটা নাইলনের বাজারের ব্যাগে রং এর বুরুশ,তুলি নিয়ে সাবধানে মাটির রাস্তা ধরে এগোচ্ছে।পেছনে রন্টুর গলা শোনা যাচ্ছে
-পাঁচ দুগুণে দশ ,তিন পাঁচে পনেরো ,চার পাঁচে কুড়ি......

বাংলা কাহিনী সাহিত্য পত্রিকা তে নিজের লেখা পাঠানোর জন্যে যোগাগোগ করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ও Email এর মাধ্যমে ।

আমাদের ফেসবুক পেইজের নাম হল..
বাংলা কাহিনী :
https://m.facebook.com/banglakahinipublisher

আমাদের ইমেইল এড্রেস হল :
ranjanshaweditor@gmail.com

Bangla Kahini publisher

West Bengal, INDIA.